বিজ্ঞান কি ও কেন?

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



৩৪৫৪

বিজ্ঞান কী ও কেন ?

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১৩৪৯

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

বাংলাদেশে প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৮৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান

মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

মূল্য : সাদা কাগজ : ২২·০০ টাকা
লেখক কাগজ : ১৬·০০ টাকা

BIGGAN Ki O KENO
[Various Aspects of Science]
By Debiprasad Chattopadhyay
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 22·00
Lekhakprint : Taka 16·00



খবর পাবার খবর

ছাদের টবে টুকটুকে লাল ফুল ফুটেছে।

কী করে জানলাম? বারে, স্বচক্ষে দেখলাম যে!

পাশের বাড়ির নেড়ী তারস্বরে গলা সাধছে।

কী করে জানলাম? বারে, কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেলো যে!

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়েই বুঝলাম, চিনি ভেবে তুমি ভুল করে নুন দিয়েছো।

কী করে জানলাম? বারে, নুনের চোটে জিভ যে পুড়ে গেলো!

আহা, অমন সুন্দর চা। কী অপরূপ না গন্ধ!

কী করে জানলাম? বারে, চায়ের বাটিটা নাকের কাছে তুলতেই গন্ধ পেলাম যে!

নুন দিয়ে অমন ভালো চা-টা নষ্ট করেছো বলায় চটে গেলে নাকি? তাহলে এসো, তোমার টাকে হাত বুলিয়ে একটুখানি আদর করে দি! আহা মরি, কী মসৃণ তোমার মাথার চুকচুকে ওই টাকটি।

কী করে জানলাম? বারে, নিজের হাতে স্পর্শ পেলাম যে!

পাঁচ-পাঁচটি খবর-দার

খবর যে দেয় তাকেই বলবো খবর-দার। পাহারা-দার পাহারা দেয়, তেমনি খবর-দার খবর দেয়। বাংলায়, খর্বদার বললে অবশ্য একটা হুঁশিয়ার হবার ইঙ্গিত থাকে। তার কারণ, বোধহয়, তখন খবর-দারেরা বড়ো একটা সুখবর দিতো না। ꞉বরং, বিপদ-আপদের খবরই দিতো।

কিন্তু যে-পাঁচটি খবরদারের কথা এখন তুলিঃ তারা শুধুই বিপদ-আপদের খবর দেয় না। সব রকম খবর দেয়। খবরের ব্যাপারে তাদের কোনো বাছবিচার নেই।

সামনে একটা সাপ দেখেই আমি তিনহাত ছিটকে গেলাম। সাপের খবরটা দিলো কে? চোখ। এটা খুব সুখবর নয়। কিন্তু ওই চোখই তো খবর দিয়েছিলো, ছাদের টবে টুকটুকে লাল ফুল ফুটেছে। দেখে আমি কী মোহিতই না হয়েছিলাম!

আমাদের বাকি চারটি খবর-দারের বেলাতেও একই কথা। ভালো খবরটাও তারা দেয়, মন্দ খবরটাও তারা দেয়—এক কথায়, যা কিছু খবর তা ওদের কাছ থেকেই পাওয়া।

চোখ দিয়ে দেখা। কান দিয়ে শোনা। নাক দিয়ে শোঁকা। জিভ দিয়ে চাখা।

কিন্তু স্পর্শ করে জানাটা কার দরুন ?

তার নাম হলো ত্বক।

চোখ-জোড়া কপালের নিচে। কানজোড়া মাথার দু'পাশে। জিভটা মুখের ভেতর। আর নাকটা ঠোঁটের ওপর।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, খবর-দারগুলির চেহারা কেমন সে খবরটা নেওয়া যাক।

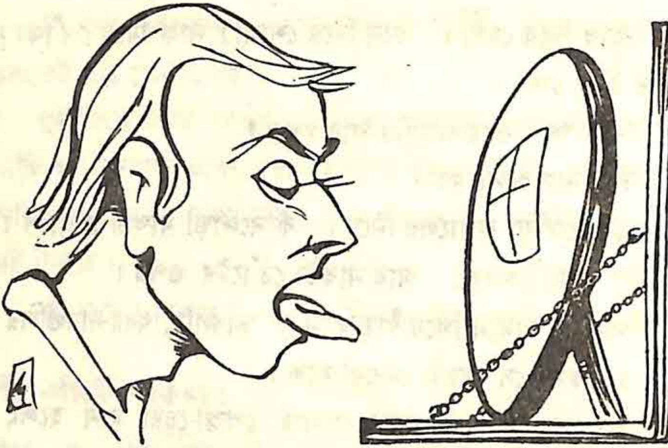
আয়নায় চোখ-জোড়াকে দেখতে পেস্তা-চেরা মনে হলো, নাকটা বেশ একটু খাঁদা-খাঁদা লাগলো। কিন্তু তাই বলে দমে যাবার কারণ নেই। চোখ-জোড়া পেস্তা-চেরার মতো না হয়ে যদি পটল-চেরা হতো তাহলেও নজরটা তো বেশী তীক্ষ্ণ হোতো না। তেমনি, নাকটাকে দেখতে খাটো বলেই খবর-দার হিসেবেও সে খাটো নয়।

আসল কথাটা হলো, আয়নায় খবর-দারদের যে-রূপ দেখলাম তা নেহাতই তাদের বাইরের রূপ—খোলসের মধ্যে যেন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তাই খোলসের চেহারায় তফাত হলেই যে খবর-দারদেরও কোনো রকম ইতর-বিশেষ হয়ে যাবে, তার কোনো মানে নেই!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খবর-দারদের দেখতে দেখতে আসল হাঙ্গামা হলো ত্বক-কে নিয়ে। ত্বক বলে খবর-দারটি গেলো কোথায় ?

আসলে, ত্বককে সনাক্ত করা অতো সহজ নয়। কেননা নাক-কানের মতো ত্বক তো আর শরীরের একটিমাত্র জায়গায় আটকা পড়ে নেই।

ত্বক আছে হাতের চেটোয়। ত্বক আছে হাতের তেলোয়।



ত্বক আছে পায়ে পিঠে—সারাটা শরীর জুড়ে, চামড়ার তলায় গা ঢাকা দিয়ে।

জুতোয় পেরেক উঠলে পায়ের তলায় যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণার খবরটা দেয় ত্বক।

পিঠে ঘামাছি ফুটলে চিড়বিড় করে। চিড়বিড়িনির খবরটা দেয় ত্বক।

গালে মশা কামড়ালে চুলকে ওঠে, মশা মারতে গালে চড় পড়লে জ্বালা করে—চুলকোনোর খবর আর জ্বালা করার খবর,—দুইই ত্বকের কাছ থেকে পাওয়া।

এটা ঠাণ্ডা ওটা গরম, এটা কঠিন ওটা নরম, আর আহামরি তোমার মাথার টাকটি কী অপরূপ মসৃণ—এসব খবর কার কাছ থেকে পাওয়া ? তার নাম ত্বক।

ফুলের রং আর গলার স্বর, নুনের স্বাদ আর চায়ের গন্ধ—ওঃ, কতো খবরই না পেয়ে গেলাম।

কার খবর? এক কথায় বলতে পারি, দুনিয়ার খবর। কেননা, ছাদের টবই হোক আর পাশের বাড়ির নেড়ীর গলাই হোক— দুনিয়া ছাড়া তো আর কিছুই নয়। সব-কিছুই হলো দুনিয়ার জিনিস। তাই এদের খবর পাওয়া মানেই দুনিয়ার খবর পাওয়া।

ওঃ, দুনিয়ায় কতো জিনিস। দুনিয়ার জিনিসের কি আর অন্ত আছে? আমাদের খবর-দারগুলিও কম তুখোড় নয়। অনবরত রাশিরাশি দুনিয়ার খবর বয়ে আনছে।

দুনিয়ার খবর পাওয়া মানেই হলো জ্ঞান পাওয়া। তাই এই এই খবর-দারগুলির কল্যাণে আমরা রাশিরাশি জ্ঞান পাচ্ছি। আমরা জ্ঞানী হয়ে উঠছি।

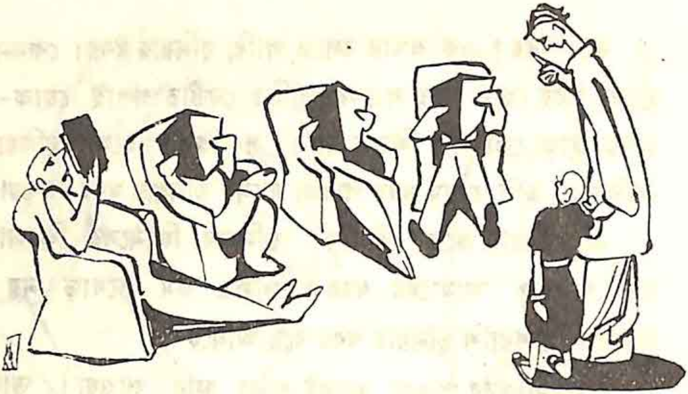
পণ্ডিতী নাম ইন্দ্রিয়

এইবার, খবর্দার! জ্ঞানীর কথা যখন উঠলো তখন একটু সাবধান হয়ে কথা বলবার অভ্যাস করতে হবে।

পণ্ডিতদের আড্ডায় যখন যাবো তখন এই খবর-দারদের আর খবরদার বলে ডাকা চলবে না। কেননা, পণ্ডিতেরা তো আর সহজ মানুষ নন। তাঁদের সঙ্গে অমন সহজ ভাষায় কথা কওয়া চলে না।

খবর-দারের বদলে কী নাম দেবো? ইন্দ্রিয়। আমরা যাদের খবর-দার বলছি, পণ্ডিতেরা তাদেরই বলেন ইন্দ্রিয়। তাই ওঁদের মতে, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এক-কথায়, পঞ্চেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

কিন্তু বলবার ভাষাটাকে এইভাবে শুধরে নিলেই পণ্ডিতেরা



খুশী হয়ে যাবেন নাকি? মোটেই নয়। পণ্ডিতদের পাল্লায় একবার যদি পড়া যায় তাহলে রকমারি সমস্যার কথা শুনতে হবে। সামস্যাগুলো নিয়ে ভেবে দেখতে হবে।

কী রকম সমস্যা? প্রথমত, একদল বলবেন, শুধু এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে মানলেই হবে না। এ-ছাড়া আরো ইন্দ্রিয় মানতে হবে।

সে-আবার কোন ধরনের ইন্দ্রিয়? কী নাম তার?

ওঁরা বলবেন, তার নাম হলো অন্তঃ-ইন্দ্রিয়। এতোক্ষণ যে-পাঁচটি ইন্দ্রিয়র কথা হলো তারা শুধু বাইরের জগৎটার খবর আনছে। তাই তারা নেহাত বহিঃ-ইন্দ্রিয়। কিন্তু খবর তো আর শুধুমাত্র বাইরের জগতের নয়। তাছাড়াও, আমরা আমাদের অন্তরের জগতের খবর পাই। যে সেই খবরগুলি সরবরাহ করে তারই নাম অন্তঃ-ইন্দ্রিয়।

এই সব খিটিমিটি তর্ক শুনে তোমার খুব রাগ হচ্ছে নাকি? কিন্তু রোসো। এই রাগের খবরটা তুমি পেলে কী করে? কার

মারফত ? রাগকে তো আর চোখেও দেখা যায় না, চেখেও দেখা যায় না—পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনোটিকে দিয়ে রাগের খবর পাওয়া যায় না। রাগটা যে নেহাতই অন্তরের ব্যাপার। পঞ্চেন্দ্রিয়রা বাইরের জগৎটার নাগাল পায়। অন্তরের নাগাল পায় না। অথচ, রাগ যে হয়েছে সে-খবরটা তুমি পেয়েছো। যদি পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সে-খবর তুমি না পাও তাহলে তোমাকে মানতেই হবে যে পঞ্চেন্দ্রিয়ই সব নয়। তাছাড়াও অন্তঃ-ইন্দ্রিয় বলে আর একটা কিছু আছে বই কি!

তর্কে হেরে গিয়ে তুমি লজ্জায় পড়লে। তোমার ইচ্ছে হলো, লজ্জায় মুখ ঢেকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু, রোসো। লজ্জা যে হলো তা তুমি জানলে কেমন করে? ইচ্ছে যে হলো তাই বা জানলে কেমন করে?

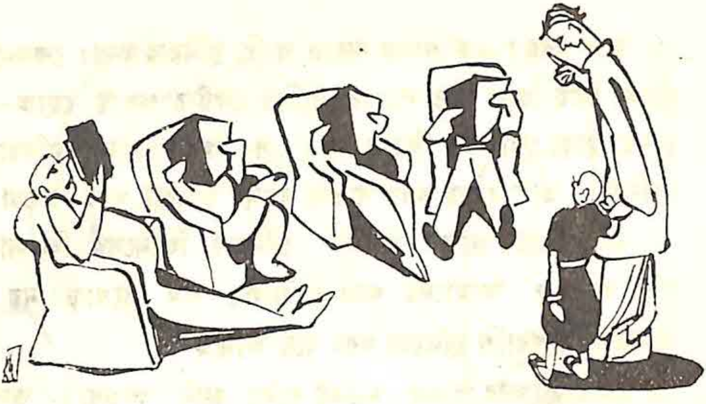
অগত্যা তুমি বললে, ওই পাঁচটি বাহির-মুখো ইন্দ্রিয় ছাড়াও আর একটি ভেতর-মুখো ইন্দ্রিয় মানতে রাজী হলাম।

দেখলাম ধুঁয়ো, জানলাম আগুন

পণ্ডিতেরা কি তাহলেই খুশী হয়ে যাবেন নাকি?

মোটেই নয়।

তাঁরা বলবেন, ইন্দ্রিয় নিয়ে আরো অনেক সমস্যা আছে, তর্ক আছে। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে নাহয় সে-সব তর্ক-বিতর্ক থেকে রেহাই দেওয়া গেলো। কিন্তু তাই বলে, তোমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া হবে না। কেননা, এখানে আরো একটা মস্ত সমস্যা বাকি থাকছে।



খুশী হয়ে যাবেন নাকি? মোটেই নয়। পণ্ডিতদের পাল্লায় একবার যদি পড়া যায় তাহলে রকমারি সমস্যার কথা শুনতে হবে। সামস্যাগুলো নিয়ে ভেবে দেখতে হবে।

কী রকম সমস্যা? প্রথমত, একদল বলবেন, শুধু এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে মানলেই হবে না। এ-ছাড়া আরো ইন্দ্রিয় মানতে হবে।

সে-আবার কোন ধরনের ইন্দ্রিয়? কী নাম তার?

ওঁরা বলবেন, তার নাম হলো অন্তঃ-ইন্দ্রিয়। এতোক্ষণ যে-পাঁচটি ইন্দ্রিয়র কথা হলো তারা শুধু বাইরের জগৎটার খবর আনছে। তাই তারা নেহাত বহিঃ-ইন্দ্রিয়। কিন্তু খবর তো আর শুধুমাত্র বাইরের জগতের নয়। তাছাড়াও, আমরা আমাদের অন্তরের জগতের খবর পাই। যে সেই খবরগুলি সরবরাহ করে তারই নাম অন্তঃ-ইন্দ্রিয়।

এই সব খিটিমিটি তর্ক শুনে তোমার খুব রাগ হচ্ছে নাকি? কিন্তু রোসো। এই রাগের খবরটা তুমি পেলে কী করে? কার

মারফত? রাগকে তো আর চোখেও দেখা যায় না, চেখেও দেখা যায় না—পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনোটিকে দিয়ে রাগের খবর পাওয়া যায় না। রাগটা যে নেহাতই অন্তরের ব্যাপার। পঞ্চেন্দ্রিয়রা বাইরের জগৎটার নাগাল পায়। অন্তরের নাগাল পায় না। অথচ, রাগ যে হয়েছে সে-খবরটা তুমি পেয়েছো। যদি পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সে-খবর তুমি না পাও তাহলে তোমাকে মানতেই হবে যে পঞ্চেন্দ্রিয়ই সব নয়। তাছাড়াও অন্তঃ-ইন্দ্রিয় বলে আর একটা কিছু আছে বই কি!

তর্কে হেরে গিয়ে তুমি লজ্জায় পড়লে। তোমার ইচ্ছে হলো, লজ্জায় মুখ ঢেকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু, রোসো। লজ্জা যে হলো তা তুমি জানলে কেমন করে? ইচ্ছে যে হলো তাই বা জানলে কেমন করে?

অগত্যা তুমি বললে, ওই পাঁচটি বাহির-মুখো ইন্দ্রিয় ছাড়াও আর একটি ভেতর-মুখো ইন্দ্রিয় মানতে রাজী হলাম।

দেখলাম ধুঁয়ো, জানলাম আগুন

পণ্ডিতেরা কি তাহলেই খুশী হয়ে যাবেন নাকি?

মোটেই নয়।

তাঁরা বলবেন, ইন্দ্রিয় নিয়ে আরো অনেক সমস্যা আছে, তর্ক আছে। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে নাহয় সে-সব তর্ক-বিতর্ক থেকে রেহাই দেওয়া গেলো। কিন্তু তাই বলে, তোমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া হবে না। কেননা, এখানে আরো একটা মস্ত সমস্যা বাকি থাকছে।

স্ববিধে থাকলেও ভালোমন্দর কথাটা অতো সহজে বলা যায় না। দশদিক ভেবে চিন্তে কথা বলবার অভ্যাস করতে হবে।

অনুমান বলে জানবার কায়দাটাকে ভালো করে বিচার করা যাক।

দেখলাম ধুঁয়ো। জানলাম আগুন। কী করে জানলাম? বারে, আগুন না থাকলে ধুঁয়ো উঠবে কেমন করে?

এই ব্যাপারটাকেই আরো একটু খুঁটিয়ে আরো স্পষ্টাও করে বোঝবার স্ববিধে হবে, যদি একটা নির্ভুল অনুমানের সঙ্গে একটা ভুল অনুমানের তুলনা করা যায়।

যেখানেই ধুঁয়ো সেখানেই আগুন থাকতে বাধ্য।

ওখানে ধুঁয়ো রয়েছে।

অতএব, ওখানে আগুন থাকতে বাধ্য।

এই তো হলো আমাদের যুক্তি। কিন্তু কেউ যদি বলতো, যেখানেই ধুঁয়ো সেখানেই বাঘ থাকতে বাধ্য।

ওখানে ধুঁয়ো রয়েছে।

অতএব, ওখানে বাঘ থাকতে বাধ্য।

তাহলে? তাহলে সেও একটা কথা অনুমান করতো বই কি। কিন্তু তার অনুমানের সঙ্গে আমাদের অনুমানের তফাত আছে। কী তফাত? তারটা ভুল আর আমাদেরটা ঠিক, নির্ভুল।

অথচ, চেহারার দিক থেকে দুটো অনুমানই কি মোটের ওপর একই রকমের নয়? হুঁ। দেখতে মোটের ওপর একই রকমের বই কি। তাহলে, এমন তফাত হলো কেন? একটা ঠিক আর একটা বেঠিক হলো কী করে? সে-আর এমন কি

কঠিন প্রশ্ন ? প্রথম অনুমানটা ঠিক, কেননা তার বেলায় যে-কথা বলে শুরু করা হচ্ছে সেই কথাটা ঠিক।

ধুঁয়ো থাকলে সত্যিই আগুন থাকবে। যেখানেই ধুঁয়ো সেখানেই সত্যিসত্যি আগুন থাকতে বাধ্য। এ-কথা ঠিক। আর এর থেকে শুরু করেছিলাম বলেই প্রথম অনুমানটা নির্ভুল হলো। কিন্তু দ্বিতীয় অনুমানটা ভুল। কেননা, তার বেলায় যে-কথা বলে শুরু করা হচ্ছে সেই কথাটাই ভুল। ঠিক নয়। ধুঁয়ো থাকলেই যে বাঘ থাকতে বাধ্য তা বলা যায় না। যেখানেই ধুঁয়ো থাকবে সেখানেই যে বাঘ থাকবে, এমনতরো কথা একেবারে আজগুবি আর অসম্ভব।

তাহলে, যে-কথাটির জোরে আমাদের অনুমানটা ঠিক হলো সেই কথাটিকে ভালো করে বিচার করা যাক। কী কথা?

যেখানেই ধুঁয়ো সেখানেই আগুন থাকতে বাধ্য।

যেখানেই ম্যালেরিয়া সেখানেই মশার কামড় থাকতে বাধ্য।

যেখানেই পেনিসিলিন সেখানেই নিউমোনিয়া-নিরাময় হতে বাধ্য।

এগুলো সব নির্ভুল কথা।

নির্ভুল অনুমান করতে হলে এই রকমেরই কোনো-না-কোনো নির্ভুল কথা থেকে শুরু করতে হবে। তাই এই ধরনের কথার বৈশিষ্ট্য ঠিক কী, গোড়ায় তাই বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

কেউ যদি বলতো, 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় আগুন থাকলে ধুঁয়োও থাকে', কিংবা, কেউ যদি বলতো 'আগুন থাকলে ধুঁয়ো থাকা সম্ভব', অর্থাৎ, বাধ্য নয়, শুধু সম্ভব,—তাহলে কি

আবার কিসের সমস্যা ?

এতোক্ষণ তো শুধু এইটুকুই বলা হলো যে ইন্দ্রিয়র সাহায্যে আমরা জ্ঞান পাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞান কি আমরা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় দিয়েই পাই নাকি ?

তুমি বলবে, বারে, তা নয়তো কি ? চোখের দেখা দেখলুম বলেই তো জানলাম যে টবের ফুলটা অমন টুকটুকে লাল। কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেলো বলেই তো জানলুম যে পাশের বাড়ির নেড়ী গলা সাধছে।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আবার এমন জিনিসের জ্ঞানও আমাদের হচ্ছে যা ইন্দ্রিয়গুলোর নাগালের একেবারে বাইরে। আর সে-রকম জিনিসের জ্ঞান হয় বলেই মানতে হবে, জ্ঞান-দাতা হিসেবে ইন্দ্রিয়রাই সব নয়। ইন্দ্রিয়র ওপর নির্ভর করা ছাড়াও আমরা অন্য ভাবে জ্ঞান পেতে পারি।

নমুনা দিতে হবে ?

বেশ। কতো নমুনা চাই ?

ওদিকের মোড় থেকে হুসহুস করে ধুঁয়ো উঠছে। ধুঁয়োর দিকে চেয়েই চিৎকার করে উঠলাম, আরে আগুন লেগেছে যে !

অর্থাৎ কিনা, খবর পেলাম। জানলাম। জ্ঞান হলো। কিসের জ্ঞান ? আগুনের।

কিন্তু আগুন কি চোখে দেখছি ? কই না তো। দেখেছি, ধুঁয়ো। শুধু ধুঁয়ো। কিন্তু তাই বলে শুধু ধুঁয়োটুকুর কথাই জানলাম না। জানতে পারলাম আগুনের কথাও।

তাহলে, এও হলো জানবার আর এক রকম কায়দা। এই



কায়দায় আমরা জ্ঞান পাচ্ছি, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়র সাহায্যে নয়—অন্য কোনো ভাবে। কী ভাবে? তাকে বলে অনুমান। ধুঁয়ো দেখেই আমি অনুমান করে ফেললাম যে ওখানে আগুন আছে।

কী করে অনুমান করলাম? বারে, আগুন না থাকলে ধুঁয়ো উঠবে কোথা থেকে? বিনা-আগুনে ধুঁয়ো ওঠে নাকি?

অর্থাৎ কিনা, আগে থাকতেই আমরা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, যেখানেই ধুঁয়ো সেখানেই আগুন। ওখানে ধুঁয়ো দেখলাম। অতএব বুঝলাম, ওখানে আগুন আছে।

একটা লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে কোঁ কোঁ করছিলো। দেখেই বুঝলাম, লোকটাকে আগে মশায় কামড়েছে। কী করে বুঝলাম? মশাকে চোখেও দেখি নি, চেখেও দেখি নি। দেখেছি শুধু লোকটার ম্যালেরিয়া জ্বর। তাই দেখেই আমি মশার কামড়টা অনুমান করে ফেললাম। কেননা, আমি আগে

থাকতেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে, যেখানেই ম্যালেরিয়া জ্বর সেখানেই মশার কামড়। মশার কামড় না হলে ম্যালেরিয়া হতে পারে না।

তাহলে, যা এখন পৃথিবীতে নেই,—যা আগে ঘটেছিলো কিন্তু এখন ফুরিয়ে গিয়েছে, শেষ হয়ে গিয়েছে,—এমন জিনিস সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান হতে পারে। মশার কামড়টা আগে ঘটেছিলো, অতীতের ব্যাপার। অথচ, অনুমানের সাহায্যে আমি অনায়াসেই তা জেনে ফেললাম।

আবার, যে-ঘটনা পৃথিবীতে এখনো ঘটে নি, পরে ঘটবে—ভবিষ্যতে ঘটবে,—অনুমানের সাহায্যে এমন কি তাকেও জেনে ফেলা যায়। দুপুর বেলায় আকাশে দেখলাম কালো মেঘের ভিড়। দেখেই বুঝলাম, বিকেলের আগেই বৃষ্টি হবে। আর সর্বনাশ, বৃষ্টি হলে ফুটবল মাঠে হেরে ঢোল হয়ে যাবো। বৃষ্টির কথা জানলাম। হেরে ঢোল হবার কথা জানলাম। অথচ এখনো বৃষ্টিই হয়নি। হেরেও ঢোল হইনি।

কিংবা বুকে ব্যথা। পিঠে ব্যথা। দারুণ জ্বর। ডাক্তার বাবু দেখেই বুঝলেন নিউমোনিয়া। অতএব, ডাক্তারবাবু একটা পেনিসিলিন ইনজেক্‌সন দিয়ে দিলেন আর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, কালকের মধ্যে জ্বর কমবে, ব্যথা কমবে। এখনো কিন্তু জ্বর কমে নি। ব্যথা কমে নি। কমবে। ভবিষ্যতের ব্যাপার। অথচ, ডাক্তারবাবু তা জেনে ফেললেন। কী করে? অনুমান করে। অনুমান করা সম্ভব হলো, কেননা আগে থাকতেই তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন যে যেখানেই পেনিসিলিন সেখানেই নিউমোনিয়া রোগ সেরে যেতে বাধ্য।



ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা শুধুমাত্র বর্তমানের জিনিসকে জানতে পারছি। পৃথিবীতে যা রয়েছে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়র সম্পর্ক ঘটলে তবেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান। কিন্তু অনুমানের সাহায্যে আমরা জানতে পারছি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। যা ছিলো কিন্তু এখন নেই, তাকেই বলে ভূত বা অতীত—যেমন ওই ম্যালেরিয়া রোগীর বেলায় মশার কামড়টা। যা এখনো ঘটে নি. পরে ঘটবে, তাকেই বলে ভবিষ্যৎ,—যেমন নিউমোনিয়া রোগীর জ্বর কমে আসা, যন্ত্রণা কমে আসা। আর পৃথিবীতে যা এখন রয়েছে, ঘটছে, তাকেই বলে বর্তমান—যেমন, ধুঁয়ো উঠতে দেখেই বোঝা গেলো ওখানে আগুন লেগেছে।

অনুমানের গোড়ার কথা

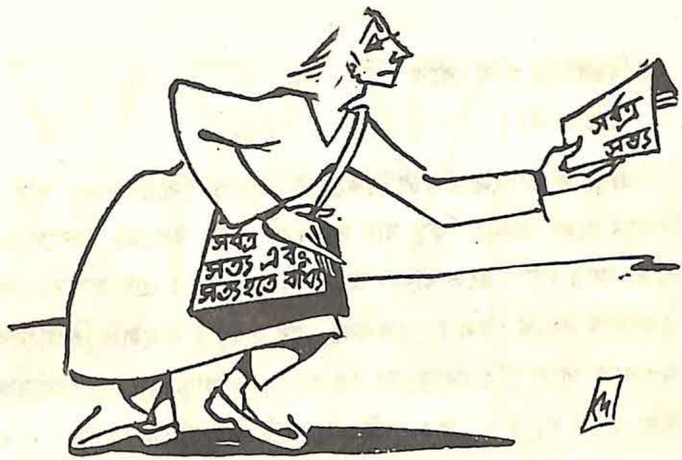
এইটুকু শুনে তুমি যদি বলে বসো যে ইন্দ্রিয়র চেয়েও অনুমান ঢের ভালো, তাহলে কিন্তু তোমার কথাটা ভয়ানক ভুল হয়ে যাবে। কেননা, ইন্দ্রিয়র তুলনায় অনুমানের কতকগুলো

তাদের কথার উপর নির্ভর করেই আমি ওখানে ধুঁয়ো দেখে বলে দিতে পারতাম যে ওখানে আগুন আছে? নিশ্চয়ই নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধুঁয়ো থাকলে আগুন থাকে; অতএব এ-ক্ষেত্রেও ধুঁয়ো আছে বলেই যে আগুন থাকবে তার কোনো মানে নেই। আবার ধুঁয়ো থাকলে আগুন থাকা সম্ভব। শুধু এইটুকু জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হলে ওখানে ধুঁয়ো দেখে আমি বড়ো জোর বলতে পারতাম যে ওখানে আগুন থাকতে পারে। কিন্তু 'থাকতে পারে' আর 'আছে'—দুটো কথা এক নয়: থাকতে পারে। মানে নাও থাকতে পারে।

আমার অনুমানটা নির্ভুল হয়েছিলো। কেননা, আমি এমন একটি জ্ঞান থেকে শুরু করেছিলাম যে-জ্ঞানের দুটো লক্ষণ ছিলো:

এক ॥ জ্ঞানটা সব-দৃষ্টান্তর বেলায় সত্যি—শুধুমাত্র কোনো-কোনো দৃষ্টান্তটুকুর বেলাতেই যে সত্যি তা নয়।

দুই ॥ জ্ঞানটার মধ্যে একটা বাধ্য-বাধকতার ভাব আছে—কথাটা শুধুমাত্র সম্ভব নয়, সুনিশ্চিত। (এই কথা শুনে একদল পণ্ডিত অবশ্যই খুব সোরগোল বাধিয়ে দেবেন। তাঁরা বলবেন, মানুষের জ্ঞান কখনোই সুনিশ্চিত হয় না। কোনো জ্ঞান হয়তো বেশি নিশ্চিত, কোনো জ্ঞান কম নিশ্চিত—বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানগুলো বেশি নিশ্চিত আর সাধারণ ধারণাগুলো কম নিশ্চিত। এই ভাবে নিশ্চয়তার কম-বেশি হতে পারে। কিন্তু মানুষের পক্ষে কোন কথাই একেবারে সুনিশ্চিত বলে জানতে পারা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এখন এ-তর্কে নাই বা গেলাম। আমরা কেবল বলবো, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান যতোখানি নিশ্চিত হতে পারে আমরা এখানে ততোখানি নিশ্চয়তাকেই 'সুনিশ্চিত' বলছি।



কেননা, বিজ্ঞান যে কী—শুধু সেইটুকু জানতে পারলেই আমরা আপাতত খুশী হয়ে যাবো)।

দুনিয়ার নানান বিভাগ

তাহলে, খবর পাবার খবর নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে দেখা গেলো, আমরা ইন্দ্রিয় ছাড়াও অনুমানের সাহায্যে জ্ঞান পেয়ে থাকি এবং অনুমানের আসল ভিত্তি হলো এমন কোনো জ্ঞান যা সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য। কুইনাইন দিলে ম্যালেরিয়া সেরে যাবে—এ-কথা যদি সবক্ষেত্রেই সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য না হোতো তাহলে আমরা কেমন করে অনুমান করতাম যে, এই রোগীটির ক্ষেত্রেও কুইনাইন দিয়ে ম্যালেরিয়া সারিয়ে দেওয়া যাবে ?

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সবক্ষেত্রে সত্যি আর সত্যি হতে বাধ্য—এমনতরো কোনো জ্ঞান পাওয়া যাবে কোথা থেকে ?

বিজ্ঞানের কাছ থেকে।

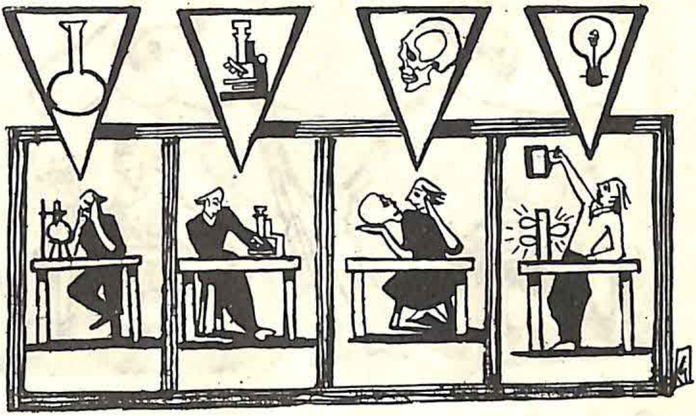
বিজ্ঞান কী?

প্রশ্নটার এখানে একটা একমেটে জবাব দিয়ে রাখা যায়। বিজ্ঞান হলো এমনই কিছু যার সাহায্যে ওই রকমের 'সবক্ষেত্রে সত্যি আর সত্যি হতে বাধ্য' জ্ঞান পাওয়া যায়। এই জবাবটাকে একমেটে বলছি কেন? কেননা, শুধু এইটুকু বললেই বিজ্ঞানের স্বরূপকে পুরোপুরি বোঝানো হয় না। এ-ছাড়াও আরো অনেক কথা বাকি থাকে। তবু, এই একমেটে জবাবটিকে পরীক্ষা করে শুরু করাই সুবিধের হবে।

প্রথমত, বিজ্ঞান জ্ঞান দিচ্ছে এবং সে-জ্ঞানটা সত্যি, নির্ভুল। কার জ্ঞান? কী সম্বন্ধে জ্ঞান? দুনিয়ার জ্ঞান। দুনিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান। দুনিয়া ছাড়া আমরা আর কী সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে পারি? যা-কিছু জানতে চাই, বুঝতে চাই, তা সবই তো এই দুনিয়ার জিনিস, সবই দুনিয়ায় রয়েছে। মহাকাশের মধ্যে ছড়ানো গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর এতোটুকু ধুলোকণা পর্যন্ত—সবকিছুই এই দুনিয়ার জিনিস, দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু তার মানে কি এই, যে বিজ্ঞান গোটা দুনিয়াটা সম্বন্ধে একসঙ্গে একটা কোনো জ্ঞান পাবার চেষ্টা করছে? তা নয়। বৈজ্ঞানিকেরা দুনিয়াটাকে নানান ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন আর এক এক দল বৈজ্ঞানিক এই সব ভাগের একএকটিকে নিয়ে ব্যস্ত।

এই জন্যেই বলা হয়, বিজ্ঞানের নানান শাখা—নানান রকমের বিজ্ঞান।



নানান রকম কেন? কেননা, বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতিকে নানান ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন; এক একটি বিভাগ সংক্রান্ত জ্ঞান পাবার চেষ্টা চলেছে বিজ্ঞানের এক একটি শাখায়।

কিন্তু তার মানে কি এই যে প্রকৃতির ওই রকমারি বিভাগগুলির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই? সম্পর্ক নেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে?

তাও নয়। একটা খুব সোজা নমুনা দেখলেই কথাটা বুঝতে পারা যাবে। ধরা যাক, মাটি আর গাছ। মাটির আলোচনা বিজ্ঞানের একটি শাখায়, গাছের আলোচনা বিজ্ঞানের অপর একটি শাখায়; অথচ গাছ তো আর শূন্যে গজায় না,



মাটির উপরই গজায়। মাটির সঙ্গে গাছের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবীড়। তাই, বিজ্ঞানের যে-শাখায় মাটি সম্বন্ধে জ্ঞান পাবার আয়োজন, আর অন্য যে-শাখায় গাছ সম্বন্ধে জ্ঞান পাবার আয়োজন—সেই দুটির মধ্যেও সম্পর্ক থাকতে বধ্য বই কি।

এই সম্পর্কের কথাটায় পরে ফেরা যাবে। আপাতত, যে-কথা হচ্ছিলো।

বিজ্ঞান কী? এ-প্রশ্নের একটা এ মেটে জবাব হিসেবে আমরা বললাম, বিজ্ঞান হলো এমন কিছু যার সাহায্যে আমরা দুনিয়ার জ্ঞান পাই—সে-জ্ঞান সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য। এই কথাটাকেই আর একটু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বললাম, সব-বিজ্ঞানই দুনিয়ার সবকিছু একসঙ্গে জানবার চেষ্টা করে না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা দুনিয়ার বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞান পাবার চেষ্টা করে।



প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক আছে

নিষ্ঠা নিয়ে দেখা

এখন প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞান যে এইভাবে জ্ঞান পাবার চেষ্টা করবে তার কায়দাকানুনটা কী রকমের হওয়া দরকার? কী ভাবে চেষ্টা করলে পর তবে এ-রকম জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে?

ভেবে দেখা যাক।

কার জ্ঞান? কী সম্বন্ধে জ্ঞান? প্রকৃতির জ্ঞান। প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান। যদি তাই হয় তাহলে প্রকৃতির দ্বারস্থ না হয়ে মানুষ কি শুধুই মাথা খাটিয়ে এ-জ্ঞান পেতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। শুধুমাত্র মাথা ঘামিয়ে আমি যে কথাটা জানবো তা যে মনগড়া কল্পনা হবে না, তার কোনো মানে নেই। বরং তা

মনগড়া কল্পনা হওয়াই সম্ভবপর। সে-সব কথার সঙ্গে সত্যিকারের পৃথিবীর সম্পর্ক থাকবে কেমন করে ?

আমি যদি প্রকৃতিকে সত্যিই জানতে চাই, বুঝতে চাই, তাহলে আমার পক্ষে সর্বপ্রথম দরকার প্রকৃতিকে দেখা—শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়, চেখে দেখা, শুঁকে দেখা, ছুঁয়ে দেখা, শুনে জানা। অর্থাৎ এককথায়, আমার ওই পাঁচটি ইন্দ্রিয়র সাহায্যে প্রকৃতির খবর যোগাড় করা।

মনে মনে ধ্যান করে প্রকৃতিকে জানা যায় না। প্রকৃতিকে জানতে হলে তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে হবে।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতিকে জানতে চান। তাই বৈজ্ঞানিকের প্রথম কাজ হলো প্রকৃতিকে দেখা। তুমিও তো অনবরতই প্রকৃতিকে দেখছো, আমিও তো অনবরতই প্রকৃতিকে দেখছি : চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, জিভ দিয়ে চাখছি, নাক দিয়ে শুঁকছি, ত্বক দিয়ে স্পর্শ করছি। যেটুকু সময় ঘুমোচ্ছি সেটুকু না হয় আলাদা কথা। কিন্তু যতোক্ষণ জেগে রয়েছি ততোক্ষণ অনবরত এইভাবে আমাদের সবাইকার কাছেই প্রকৃতির খবর আসছে।

কিন্তু তাই বলেই কি আমরা সবাই বৈজ্ঞানিক হয়ে গিয়েছি নাকি ? তা নয়। আমরা সবাই চেষ্টা করলে, খেয়াল রাখলে, বৈজ্ঞানিক হতে পারি বইকি। কিন্তু সাধারণত আমরা প্রকৃতিকে যে ভাবে দেখি শুধু সেইভাবে দেখলেই বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। কেননা, আমাদের পক্ষে সাধারণ ভাবে প্রকৃতিকে দেখা আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রকৃতিকে দেখা—এই দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত আছে।

কী রকমের তফাত? এককথায়, তফাতটা হলো এই যে প্রকৃতিকে দেখবার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণের চেয়ে অনেক হুঁশিয়ার, অনেক বেশি নিষ্ঠাবান।

এই কথাটা একটুখানি খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

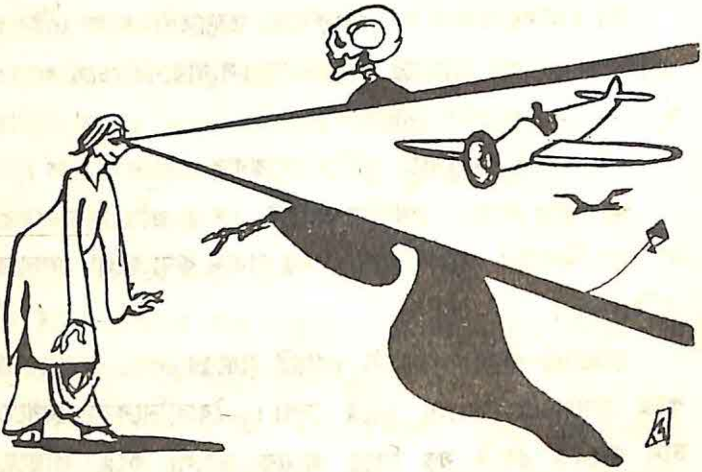
আমাদের সাধারণ দেখাটায় প্রায়ই দেখার প্রতি নিষ্ঠা থাকে না, বৈজ্ঞানিকদের কাছে দেখবার সময় প্রধান কথা হলো দেখবার প্রতি নিষ্ঠা।

আমাদের সাধারণ দেখাটা প্রায়ই অযত্নের দেখা, হেলাফেলা করে দেখা, এলোমেলো ভাবে দেখা। বৈজ্ঞানিকেরা দেখতে চান অনেক বেশি যত্ন নিয়ে, অনেক ভালো করে, গুছিয়ে, খতিয়ে।

দেখার ব্যাপারে নিষ্ঠা আবার কী? দেখার ব্যাপারে যত্নই বা কী রকম

ধরা যাক, সূর্যগ্রহণ হচ্ছে। আমি সূর্যগ্রহণ দেখলাম দেখলাম কালো ছায়ার সাজে রাহু এসে সূর্যকে গিলে ফেললো। বৈজ্ঞানিকও দেখলেন। কিন্তু তিনি রাহুকে দেখতে পেলেন না। তিনি শুধু দেখলেন, ছায়া পড়ছে সূর্যের উপর।

আমি সূর্যগ্রহণ দেখতে গিয়ে রাহুকেও দেখলাম কেন? কেননা, অনেকদিন থেকে আমি গল্প শুনেছি, রাহু সূর্যকে গিলে ফেলে বলেই গ্রহণ হয়। শুনতে শুনতে, শুনতে শুনতে, আমার মনে একটা গভীর সংস্কার জন্মে গিয়েছে। আমি যখন সূর্যগ্রহণ দেখলাম তখন ওই সংস্কার এসে আমার মনকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি সেই সংস্কারের প্রভাবে পড়ে অনেক কথা কল্পনা করে নিলাম। আর, সত্যিই যা দেখছি তার



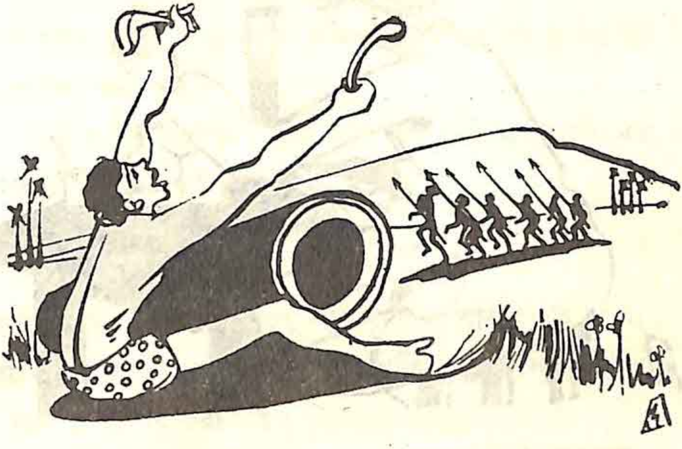
বৈজ্ঞানিক হিসেবে কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে
শুধু যেটুকু দেখছি সেটুকুকেই মানছি

ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিলাম এই কল্পনাকে। ফলে আমার দেখাটা নিছক দেখা হলো না। তার খানিকটা সত্যিকারের দেখা, খানিকটা কল্পনা।

আমাদের অনেকের মনে অনেক রকমের সংস্কার আছে। আমরা অনেক সময় সেইসব সংস্কারের মোহে পড়ি।

আর যদি তাই পড়ি তাহলে কি প্রমাণ হবে না যে, দেখা বলে কাজটি সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্ট নিষ্ঠা নেই? যদি তা থাকতো, তাহলে আমরা মনের সংস্কারকে সরিয়ে রেখে ঠিক কী দেখছি, ঠিক কতোটুকু দেখছি—সে-বিষয়েই হুঁশিয়ার থাকবার চেষ্টা করতাম।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখেন। এবং দেখার প্রতি অগাধ নিষ্ঠা তাঁদের। তাই তাঁরা বলবেন, দেখবার সময়ে কোনো রকম



আদিম ধর্মবিশ্বাস : এর মূল কথাটা হলো মানা, স্বীকার করা, বিশ্বাস করা

সংস্কারকেই আমল দেওয়া হবে না। ঠিক যেটুকু দেখতে পাবো নিছক সেইটুকুকেই দেখবো, তার বেশি কোনো কথা কল্পনা করে চোখে দেখাটুকুর ঘাড়ে তা চাপিয়ে দেবো না।

দেখবার প্রতি এই নিষ্ঠাটা খুবই বড়ো কথা। এই নিয়েই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের মস্ত তফাত। ধর্ম বলবে, স্বচক্ষে দেখবার ওপর অতোখানি আস্থা রাখা কোনো কাজের কথা নয়। কেননা, অনেক জিনিস আছে যা চোখে দেখতেই পাওয়া যায় না। মানতে হয়। বিশ্বাস করতে হয়। তবেই সে-জিনিস পাওয়া যায়। আগে দেখবো তবে মানবো—এমনতরো গোঁ ধরে থাকলে চলবে না।

বিজ্ঞান বলবে, তা নয়। বিশ্বাস নয়। মানা নয়। দেখা। আর অযত্ন করে এলোমেলো ভাবে দেখাও নয়। সংস্কার বাদ দিয়ে ভালো করে দেখা। খুটিয়ে দেখা। বার বার দেখা।



তাড়াহুড়ো করে দেখা নয়। তাতে ভুল হয়ে যেতে পারে। সুস্থ হয়ে, শান্ত ভাবে দেখা।

যে-জিনিস আরো পাঁচ-রকম জিনিসের সঙ্গে মিশে জটিল হয়ে আছে তাকে যদি সেই অবস্থাতেই দেখবার চেষ্টা করি তাহলে ভুল হয়ে যাবার ভয়। তাই তাকে দেখবার সময় খুটিয়ে বিচার করে, বাকি জিনিসগুলো থেকে আলাদা করে নিয়ে, তবে দেখতে হবে।

একবার দেখলে সে দেখায় ভুল থাকতে পারে। তাই দশবার দেখবো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হবে। দশবার দেখলেও দেখায় ভুল থাকতে পারে। তাই বিশবার দেখতে হবে। হাজার বার দেখতে হবে।

এলোমেলো ভাবে, হুঁশিয়ার না হয়ে, দেখবার আয়োজন করলে সে-দেখায় ভুল থাকতে পারে। তাই সাবধানে, নির্মল সংস্কারমুক্ত মনে, বিচার করে, শান্ত হয়ে তবে দেখতে হবে।

অতএব বৈজ্ঞানিকদের এই দেখা আমাদের সাধারণ জীবনের আটপৌরে দেখার মতো নয়। তাই এর জন্যে একটা ভালো নাম খুঁজে বের করা যাক।

নিরীক্ষণ বা নিরীক্ষা। তার মানে দেখা—কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা যে-ভাবে দেখেন, সেই ভাবে।

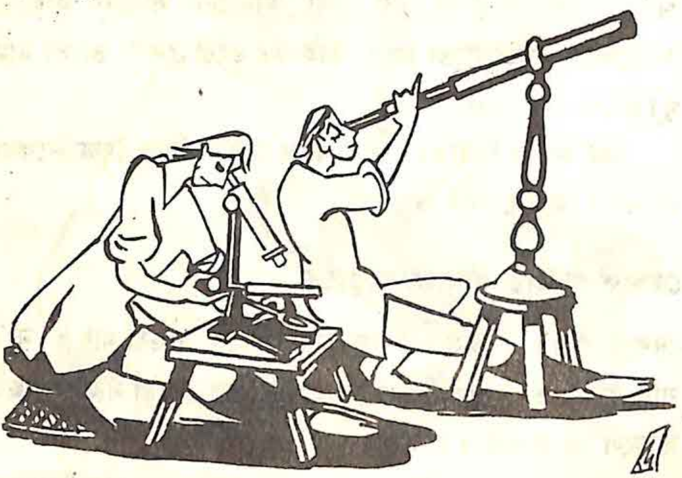
দেখতে পাবার সীমানা বাড়ানো

দেখতে হবে। কিন্তু সবকিছুই কি দেখতে পাওয়া যায়? না। যায় না। আমাদের দেখতে পাবার শক্তির একটা সীমা আছে। তাহলে কী উপায় করা যায়?

চোখে দেখার কথাই ধরা যাক। সূর্যগ্রহণ শুরু হয়েছে: সূর্যের দিকে তাকাতে গিয়েই চোখ ঝলসে গেলো। তাড়াতাড়ি একটুকরো কাঁচের ওপর প্রদীপের ভুসো ফেলে কাঁচটা কালো করে নিলাম। তারপর সেই কালো কাঁচটার ভেতর দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালাম। গ্রহণ দেখতে পেলাম—একেবারে সুস্পষ্ট ভাবে। মামা বললো, গ্রহণ দেখবার জন্যে খাসা একটা যন্তর বানিয়েছিস তো!

যন্ত্র! হাঁ, যতো সাদামাটাই হোক না কেন,—আমার এই ভুসো মাখানো কাঁচের টুকরোটাকে এক রকমের যন্ত্র বলতে হবে বই কি! কিসের যন্ত্র? দেখতে পাবার সীমানা বাড়াবার যন্ত্র। যা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই দেখতে পেলাম এটার সাহায্যে।

বৈজ্ঞানিকেরা হলেন, যাকে বলে নিরীক্ষণ-বিভোর মানুষ। নিরীক্ষণ মানে দেখা,—ভালো করে দেখা, বৈজ্ঞানিক ভাবে



দেখা। কিন্তু মানুষের পক্ষে দেখতে পাবার একটা সীমা আছে। ফলে, বৈজ্ঞানিকেরা উঠে পড়ে লাগলেন এই সীমাটাকে বাড়াবার চেষ্টায়। কী ভাবে বাড়ানো যায়? যন্ত্রপাতির সাহায্যে। তাহলে যন্ত্রপাতিগুলোর উদ্দেশ্য ঠিক কী? যা এমনি চোখে সাধারণ ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না তাও যাতে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় তারই ব্যবস্থা করা।

কী রকম যন্ত্র? যেমন ধরা যাক, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। এই যন্ত্রর সাহায্যে দূরের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়—এতো দূরের সব জিনিস যে এমনিতে সেখান পর্যন্ত নজর চলে না। আকাশের গ্রহ-তারা-নীহারিকারা আমাদের কাছ থেকে এতোদূরে রয়েছে যে খালি চোখে চেয়ে দেখলে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবরই পাওয়া যায় না। অথচ এই দূরবীক্ষণের সাহায্য নিয়েছেন বলে বৈজ্ঞানিকেরা এগুলিকে কতো ভালো করে দেখেছেন।

দূরবীক্ষণ তাহলে কী করেছে? দেখতে পাবার সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিংবা ধরা যাক অণুবীক্ষণ। দুনিয়ায় বীজাণু ইত্যাদি এতো অসম্ভব ছোটো ছোটো জিনিস যে শুধু চোখে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। সে-রকম জিনিসগুলোকে দেখবার জন্যে তাই বৈজ্ঞানিকেরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছেন—অসম্ভব রকম ক্ষুদে ক্ষুদে জিনিসকেও এই যন্ত্রর সাহায্যে অনেক বড়ো করে, অতএব অনেক ভালো করে, দেখতে পাওয়া সম্ভব।

অণুবীক্ষণ তাহলে কী করেছে? দেখতে পাবার সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে।

দেখতে পাবার সীমা বাড়াবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা এই রকমের অনেক যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন।

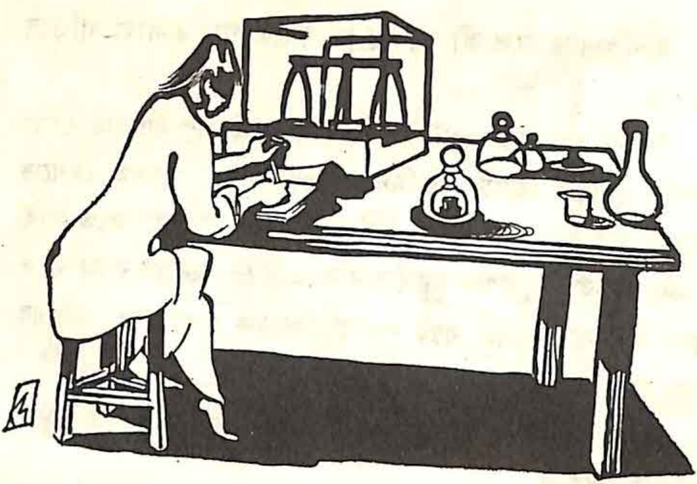
ল্যাবরেটারি কেন?

বৈজ্ঞানিক হতে গেলে ল্যাবরেটারি লাগবে না?—বাংলায় যাকে আমরা বলি গবেষণাগার?

লাগবে বই কি। কিন্তু কেন লাগবে? নানা রকম পরীক্ষা করতে হবে।

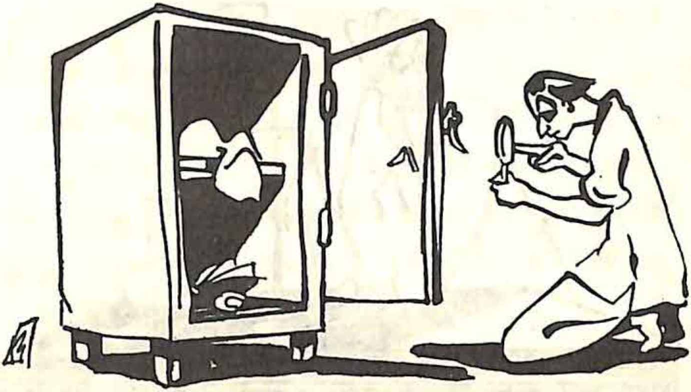
পরীক্ষা আবার কী? তাও এক রকমের দেখা, এক রকমের নিরীক্ষণ করা। তবে তার নাম নিরীক্ষা না হয়ে পরীক্ষা হলো কেন? কেননা, ল্যাবরেটারিতে এই যে দেখা,—যার নাম দেওয়া হয় পরীক্ষা,—এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। সুবিধেও আছে।

তফাতটা দেখা যাক।



নিরীক্ষণ কী ? প্রকৃতিতে একটা কোনো ঘটনা ঘটলো— বৈজ্ঞানিক সেই ঘটনাটাকে দেখলেন। এই যে-ঘটনাটা ঘটলো এর উপর কি বৈজ্ঞানিকের কোনো হাত আছে ? তা নেই। ঘটনাটা ঘটছে, বৈজ্ঞানিক শুধু দেখলেন। কিন্তু ল্যাবরেটারির মধ্যে তা নয়। সেখানে বৈজ্ঞানিক যে-ঘটনাটিকে দেখছেন তা ঠিক কী অবস্থার মধ্যে ঘটবে, কতোবার ঘটবে,—ইত্যাদি অনেক কিছুই বৈজ্ঞানিকের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তাই বলে, ল্যাবরেটারির মধ্যে যে-ঘটনাটি ঘটবে তাও সৃষ্টিছাড়া ঘটনা নয়। তাও প্রাকৃতিক ঘটনাই। কেবল, প্রকৃতিতে স্বাভাবিক-ভাবে-ঘটা ঘটনা নয়। ল্যাবরেটারির মধ্যে কৃত্রিম অবস্থায় ঘটানো প্রাকৃতিক ঘটনা।

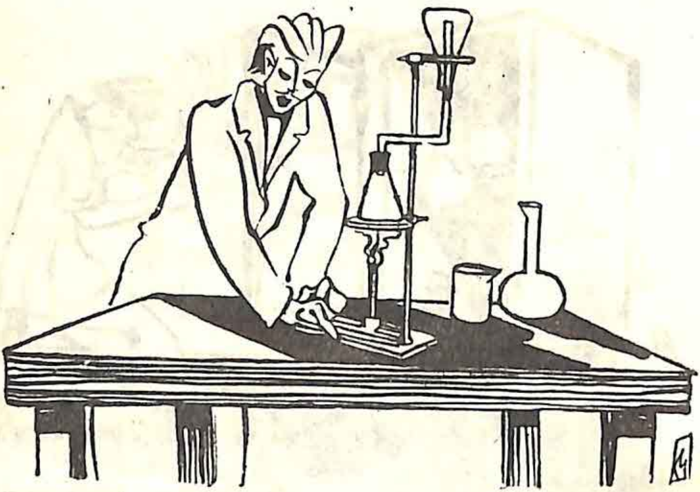
কথাটা শুনতে হয়তো খটোমটো লাগলো। তাই আরো একটু খুলে বলবার চেষ্টা করা দরকার।



ডিটেক্‌টিভ্ পরীক্ষা করছে, না, নিরীক্ষা করছে ?

আকাশে সূর্যগ্রহণ হলো। আমি দেখলাম। যাতে ভালো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে না হয় কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে অবস্থায় সূর্যগ্রহণটা ঘটলো তার উপর কি আমার কোনো হাত ছিলো ? নিশ্চয়ই নয়। আকাশে যদি হঠাৎ মেঘ এসে যায় তাহলে তো সব মাটি। আর ওই মেঘ-আসা-না-আসার উপর আমার কি কোনো হাত আছে ? নিশ্চয়ই নয়। তাছাড়া, সূর্যগ্রহণকে একবার দেখে আমি যদি সব ব্যাপারটা বুঝতে না পারি,—যদি আবার দেখবার দরকার হয়, বার বার দেখবার দরকার হয়—তাহলে ? তাহলেও আমি নিরুপায়। কেননা, প্রকৃতিতে সূর্যগ্রহণ যখন ঘটবার শুধু তখনই ঘটবে, যতোদিন পর পর ঘটবার ততোদিন পর পরই ঘটবে ; আমি কতোবার দেখতে চাই, কী রকম অবস্থায় দেখতে চাই,—তার তোয়াক্কা না করেই ঘটবে।

আকাশের মুখ চেয়ে থাকবার বদলে আমি যদি একটা ঘরের



মধ্যে একটা চাঁদ, একটা সূর্য আর একটা পৃথিবীকে ধরে আনতে পারতাম ? তাহলে যতোবার দরকার, যে-অবস্থায় দরকার— সূর্যগ্রহণ ঘটাতে পারতাম। আর, একেবারে দেখার আশ মিটিয়ে দেখতে পারতাম সূর্যগ্রহণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঘরের মধ্যে চাঁদ সূর্য সত্যিই ধরে আনা যায় না। খুশি মতো ঘটানো যায় না সূর্যগ্রহণ। তাই এ-ধরনের ঘটনা দেখবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা নিরুপায় ভাবে প্রকৃতির মুখ চেয়েই থাকতে বাধ্য। হয়তো, হিসেব করে দেখা গেলো, অমুকদিন পূর্ণ গ্রহণ হবে আর তমুক দ্বীপ থেকে তা সবচেয়ে সুবিধেজনক ভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। অগত্যা, বৈজ্ঞানিকেরা মালপত্র আর যন্ত্রপাতি নিয়ে রওনা হলেন সেই দ্বীপটিতে। কিন্তু সেদিন যদি কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায় ?

তাহলে তো সবই মাটি ! বৈজ্ঞা ি করা নিরুপায়। এ-রকম ঘটনার ওপর তাঁদের কোনোই হা নেই।

সুখের বিষয়, সমস্ত ঘটনাই ঠিক এই রকমের নয়।

প্রকৃতির এমন বহু ঘটনা আছে যা মানুষের আয়ত্তে এসেছে। মানুষ শিখেছে, সুবিধে মতো অবস্থায় সেইসব ঘটনাকে ঘটাতে পারবার উপায়। সেই ধরনের ঘটনাগুলোকেই ল্যাবরেটারির মধ্যে ঘটাবার আয়োজন করা হয়।

সেই ঘটনাটিকে আশ মিটিয়ে দেখে নেওয়া সম্ভবপর। প্রকৃতিতে যে-সব ঘটনা স্বাভাবিক ভাবে ঘটছে সেগুলিকে এইভাবে আশ মিটিয়ে দেখে নেওয়া যায় না। তাইজন্যেই তো বৈজ্ঞানিকেরা ল্যাবরেটারি বানান; যে-ঘটনাকে তাঁরা দেখতে চান তাকে ওই ল্যাবরেটারির মধ্যে কৃত্রিমভাবে ঘটতে বাধ্য করেন। তারপর দেখেন। সে-দেখারই নাম হলো পরীক্ষা।

তাহলে, বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে দেখা বলে কাজটি আসলে দু'রকমের।

এক ॥ নিরীক্ষা : প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে যে-ঘটনা ঘটছে সে-ঘটনাকে সেই ভাবেই দেখা।

দুই ॥ পরীক্ষা : ল্যাবরেটারির মধ্যে কৃত্রিম ভাবে একটি ঘটনাকে ঘটিয়ে নিয়ে তারপর দেখা।

নিরীক্ষার সুবিধেও আছে, কিন্তু অসুবিধে বেশি। সুবিধেটা কী রকম? এমন অনেক ঘটনা আছে যা ল্যাবরেটারির মধ্যে কৃত্রিম ভাবে ঘটানো যায় না। যেমন, আগেই বললাম, গ্রহ-তারা-নাহারিকা সংক্রান্ত ঘটনা। তাই এগুলি সম্বন্ধে খবর পাবার একমাত্র উপায় হলো নিরীক্ষা। পরীক্ষার তুলনায়

নিরীক্ষার এই হলো প্রধান সুবিধে: নিরীক্ষার প্রসার অনেক বেশি—যা পরীক্ষার সাহায্যে জানা সম্ভবই নয় তা নিরীক্ষার সাহায্যেই জানতে হয়।

কিন্তু নিরীক্ষার অসুবিধে অনেক রকম। নিরীক্ষার বেলায় তো প্রকৃতির মুখ চেয়ে থাকা। তাই, ঘটনাটা কতোবার ঘটবে, কতোদিন পর পর ঘটবে, কোন অবস্থায় ঘটবে, ঘটবার সময়ে আরো সব কতোরকম ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে ঘটবে—এসব ব্যাপারের ওপর বৈজ্ঞানিকদের কোনোই হাত নেই। অথচ, ঘটনাটিকে যদি ঠিকমতো জানতে হয় তাহলে বার বার, বার বার দেখতে পাওয়া প্রয়োজন, নানান অবস্থার মধ্যে তাকে ঘটতে দেখা প্রয়োজন, প্রয়োজন বাকি সব ঘটনার প্রভাব থেকে আলাদা করে নিয়ে নিছক সেই ঘটনা হিসেবে তাকে ঘটতে দেখা। তাছাড়া, নিরীক্ষার সময় একটা তাড়াহুড়োর ভাব থাকে—একবার ফসকে গেলে ঘটনাটা হয়তো আর ইহজীবনে দেখতেই পাওয়া যাবে না। পরীক্ষার সময় এ রকম কোনো তাড়াহুড়োর কারণ নেই। ধীরেসুস্থে মন স্থির করে দেখলেই হলো। কেননা, ঘটনাটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। যতোবার দেখা দরকার ল্যাবরেটারির মধ্যে ততোবার তা ঘটানো যাবে।

নিরীক্ষার যেগুলো অসুবিধে পরীক্ষার সেইগুলোই হলো সুবিধে। বৈজ্ঞানিকদের কাছে নিরীক্ষারও দাম আছে, পরীক্ষারও দাম আছে। তবে, দুয়ের মধ্যে পরীক্ষার দামই বেশি। কেননা, পরীক্ষায় অতো রকম সুবিধে আছে বলেই ভুলের ভয়টা কম।

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাই ল্যাবরেটারির অতো দরকার। ল্যাবরেটারি মানে হলো, যে-জায়গায় পরীক্ষা করা হবে।

সে-জায়গায় অনেক রকম আয়োজন থাকা দরকার। একটি ঘটনাকে প্রয়োজন মতো ঘটাতে হবে,—যতোবার দরকার ততোবার ঘটাতে হবে, যে-ভাবে ঘটানো দরকার সেইভাবে ঘটাতে হবে, যে-অবস্থার মধ্যে ঘটানো দরকার সেই অবস্থার মধ্যে ঘটাতে হবে। তোড়জোড় করা চাই বইকি। সে কি কম তোড়জোড় ?

নিরীক্ষা আর পরীক্ষার মধ্যে তফাত দেখানো হলো। কিন্তু একটা কথা বলে না নিলে ভুল বোঝবার ভয় আছে। পরীক্ষার সময়ে কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে আমি একটা ঘটনা ঘটাচ্ছি। কিন্তু তাই বলে ঘটনাটাই কৃত্রিম নয়। প্রকৃতির ঘটনাই—তবে স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতিতে যে-ভাবে ঘটে সেইভাবে না ঘটে আমার আয়োজন মেনে, যে-ভাবে এবং যতোবার তাকে ঘটতে দেখলে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে জানবার সুবিধে হয় সবচেয়ে বেশি সেইভাবেই এবং ততোবার ঘটনাটাকে ঘটানো হবে। তবুও সেটা প্রকৃতির ঘটনাই, প্রাকৃতিক ঘটনাই। কৃত্রিম অবস্থায় ঘটছে বলে ঘটনাটাই কৃত্রিম নয়। স্বাভাবিক ভাবে ঘটতে পারছে না বলেই ঘটনাটা অস্বাভাবিক নয়। যেমন ধরো, বনজঙ্গলে না জন্মে একটা বাঘের ছানা যদি মানুষের তৈরী চিড়িয়াখানায় জন্মায় তাহলেই তো আর সেটা মানুষের ছানা হয়ে যাবে না। সেটা আসলে বাঘের ছানাই। তবে স্বাভাবিকভাবে যে-অবস্থায় বাঘের ছানা জন্মায় সেই অবস্থায় জন্মায় নি।

তেমনি, ল্যাবরেটারির মধ্যে যে-ঘটনা ঘটলো তা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে ঘটলেও আসলে প্রাকৃতিক ঘটনাই।

কথাটা জরুরি। কথাটা তাই স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কেননা, ল্যাবরেটারির ভিতরকার ঘটনাগুলি যদি সত্যিই

প্রাকৃতিক ঘটনা না হতো তাহলে সেগুলিকে দেখে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে প্রকৃতিকে জানা,—প্রকৃতিকে চেনা,—সম্ভবই হোতো না। তার মানে, ল্যাবরেটারি তৈরী করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের আসল উদ্দেশ্যটাই যেতো ভেস্তে। বৈজ্ঞানিকদের আসল উদ্দেশ্যটা কী? প্রকৃতিকে জানা। প্রকৃতির জ্ঞান পাওয়া।

প্রকৃতির নিয়মকানুন মানে কী?

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, প্রকৃতির জ্ঞান পাওয়া। কিন্তু যেমন-তেমন জ্ঞান হলেই হবে নাকি?

তা নয়।

ছাদের টবে টুকটুকে লাল ফুল ফুটেছে। চেয়ে দেখলাম। জানতে পারলাম, অর্থাৎ জ্ঞান হলো। কিন্তু বিজ্ঞান কি শুধু এই ধরনের জ্ঞান পেয়েই খুশী হবে যাবে? তা নয়। বিজ্ঞান চাইছে এমন কথা জানতে যা সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য। সে-রকম কথাকেই বলে প্রকৃতির নিয়ম। বিজ্ঞান জানতে চাইছে। কী জানতে চাইছে? প্রকৃতির নিয়মকে। এ-ঘটনা, বা ওই-ঘটনা, বা কোনো একটা টুকরো ঘটনা নয়—এমন সব নিয়ম যা দিয়ে একই জাতের সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যাবে।

সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য—এ-হেন জ্ঞানের দরকার যে কেন তা তো আগেই বলেছি। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়র উপর নির্ভর করলে প্রকৃতির সামান্য খবর জানতে পারা যায়। যেটুকু দেখলুম শুধু সেইটুকুই জানলুম। ধুঁয়ো দেখলুম, ধুঁয়ো জানলুম। ব্যস্, ওই পর্যন্তই। ধুঁয়ো দেখেই যদি আগুনের কথাও জানতে হয় তাহলে ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরো কিছুর উপর

নির্ভর করতে হবে। কিসের উপর? তার নাম অনুমান। ধুঁয়ো দেখেই আগুনকে জানলুম—অর্থাৎ কিনা, আগুনের কথা অনুমান করে ফেললুম। কী করে অনুমান করলাম? কেননা, আমার আগে থাকতেই জানা আছে, যেখানেই ধুঁয়ো সেখানেই আগুন থাকতে বাধ্য। এই যে কথাটা আগে থাকতেই জানা ছিলো—এ হলো একরকমের **সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য** ধরনের জ্ঞান। সে-রকমের জ্ঞানের সাহায্য না পেলে অনুমান সম্ভবই নয়। আর অনুমান করতে যদি নাই পারি তাহলে প্রকৃতির জ্ঞানটা যৎসামান্য হয়ে থাকবে যে!

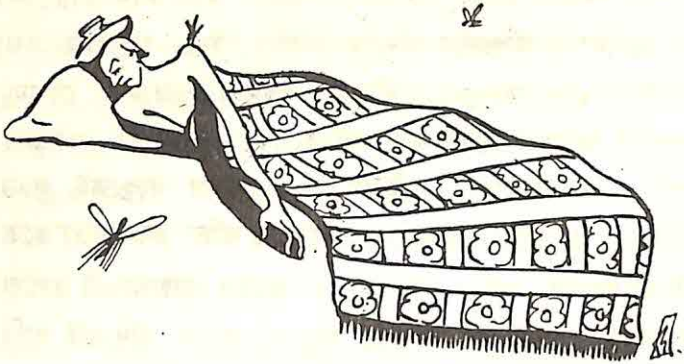
বৈজ্ঞানিক যদি প্রকৃতিকে জানতে চান তাহলে তাঁর পক্ষে অনুমানের উপর নির্ভর করা দরকার। অনুমানের উপর নির্ভর করতে হলে এমন জ্ঞান পাওয়া দরকার যা সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য। তাই আমরা সেই রকম জ্ঞান পাওয়ার কায়দা নিয়ে কথা তুলতে বাধ্য হলাম।

সবক্ষেত্রে সত্যি আর সত্যি হতে বাধ্য—এমনতরো কোনো জ্ঞান যদি পাওয়া যায় তাহলে তাকে বলবো প্রকৃতির নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞান।

একটা নমুনা দেখা যাক।

রাধেশ্যামবাবু পাকুড় গিয়ে ম্যালেরিয়া ধরিয়েছেন। পুরো ঘটনাটাই আগাগোড়া আমার চোখে দেখা ঘটনা। আমার জ্ঞান।

কিন্তু এই জ্ঞানটিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আসল নমুনা বলবো না। কেননা, এটা প্রকৃতির নিয়ম সংক্রান্ত কথা নয়—এমন কোনো কথা নয় যা সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য। যদি তাই হোতো তাহলে—



রাধেশ্যাম বাবুর পাকুড় গিয়ে ম্যালেরিয়া ধরেছে



ঘনশ্যামের কিন্তু পাকুড় না-গিয়েই ম্যালেরিয়া হয়েছে

: যে-লোকেরই ম্যালেরিয়া হয়েছে তাকেই পাকুড়-ফেরত বলতে হোতো।

: যে-লোকই পাকুড় গিয়েছে সেই ম্যালেরিয়া ধরাতে বাধ্য হতো।

কিন্তু সত্যিই তো আর তা নয়। কেননা, পাকুড় না গিয়েও অনেকের ম্যালেরিয়া হয়েছে। আবার, পাকুড় গিয়েও অনেকের ম্যালেরিয়া হয়নি। তাই পাকুড় গেলে ম্যালেরিয়া ধরবে—এ-কথাকে কোনো রকম প্রকৃতির নিয়ম বলবার যো নেই।

প্রকৃতির নিয়ম হবে শুধু তখনই যখন কিনা কথাটা সবক্ষেত্রে সত্যি আর সত্যি হতে বাধ্য। তারই নিয়ম প্রকৃতির নিয়ম। প্রশ্ন হলো, এ-ধরনের নিয়মকানুন জানা যাবে কী করে?

আমরা আগেই দেখেছি যে, ওই রকমের জ্ঞান পেতে হলে শুরু করতে হবে নিরীক্ষা-পরীক্ষা থেকেই। কেননা, নিরীক্ষা আর পরীক্ষা বাদ দিয়ে প্রকৃতিকে জানবার কোনো উপায়ই নেই।

আমরা এইবার দেখাবার চেষ্টা করবো যে, নিরীক্ষা আর পরীক্ষা করে শুরু করতে বাধ্য হলেও বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে শুধু তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কোনো কাজের কথা নয়। শুরু করতে হবে তাই দিয়েই; কিন্তু ওখানেই শেষ করা চলবে না।

কেন চলবে না? তার কারণ, শুধুই নিরীক্ষা আর পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে এমন কোনো জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয় যা সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য।

একটুখানি ভাবতে রাজী হলেই বুঝতে পারবে কথাটা কেন বলছি।

নিরীক্ষা আর পরীক্ষা। তার মানে দেখা—প্রকৃতিতে ঘটনাটা যেভাবে ঘটছে সেইভাবেই ঘটতে দেখা, কিংবা, ল্যাবরেটারির মধ্যে আমার চাহিদা মতো অবস্থায় ঘটনাটাকে ঘটতে বাধ্য করে তারপর দেখা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এইভাবে আমার পক্ষে কতো ঘটনা দেখতে পাওয়া সম্ভব? ধরা যাক আমি পণ করলাম, ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রান্ত ঘটনাগুলি আমি প্রাণভরে দেখে নেবো। কিন্তু সারা জীবনপাত করেও আমি সবসুদ্ধ কতো ঘটনা দেখতে পাবো? দশ বিশ, দুশো চারশো, হাজার, লক্ষ, কোটি? বাস্‌রে! দেখতে দেখতে আমার চুল পেকে যাবে—বুড়ো হয়ে আমি মরে যাবো। মরবার আগে আমি হয়তো ভাববো : সারা জীবন ধরেই তো আমি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত ঘটনা দেখবার চেষ্টা করেছি। বহুৎ দেখেছি। কিন্তু তাই বলে এ-জাতীয় সমস্ত ঘটনাই কি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছে?

মোটেই নয়। সমস্ত বলতে বোঝায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের যতো ঘটনা তার সমষ্টি। অতীতে যা ঘটেছে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে, বর্তমানে যা ঘটছে। আমি তো কোন ছার—কিন্তু পৃথিবীর কারুর পক্ষেই এতো ঘটনার সমস্ত দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। আমি জন্মাবার আগে যতো ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা আমার পক্ষে কেমন করে দেখতে পাওয়া সম্ভব? আমি মারা যাবার পরে যে-সব ঘটনা ঘটবে তাই বা আমি দেখবো কেমন করে? এমন কি বর্তমানেও যতো ঘটনা ঘটছে তার সবও তো আমার চোখের সামনে ঘটছে না।

তাই আমি হাজার মাথা খুঁড়ে মরলেও শুধুমাত্র দেখার উপর

নির্ভর করে,—শুধুমাত্র পরীক্ষা আর নিরীক্ষার উপর নির্ভর করে,—এক জাতীয় সমস্ত ঘটনাকে কোনোমতেই জানতে পারি না। আর তাই শুধুমাত্র নিরীক্ষা আর পরীক্ষার উপর নির্ভর করে আমি কিছুতেই জ্ঞান পেতে পারি না যা সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য।

দেখার উপর নির্ভর করে আমি বড়ো জোর কী বলতে পারি ?

আমি বলতে পারি, মোট এতো দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি আর তাই শুধু অতো দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আমি জ্ঞান পেয়েছি। অর্থাৎ কিনা, এমন কোনো জ্ঞান আমি এখনো পাইনি যা সবক্ষেত্রেই সত্য। কেননা, সবক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত আমার পক্ষে দেখতে পাবার কোনো উপায় নেই।

শুধুমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভর করে আমি কী বলতে পারি ? যতো দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি তার বেলায় ঘটনাগুলো এইভাবে ঘটে। কিন্তু এই রকমটাই যে হতে বাধ্য তা আমি শুধুমাত্র দেখার উপর নির্ভর করে বলবো কেমন করে ? বাধ্যবাধকতা বলে কোনো ব্যাপার তো আর চোখে দেখা যায় না। বিষ খেলে মানুষ মরে। এ রকমটা আমি হতে দেখেছি। তাই আমি বলতে পারি যে এ-রকমটা হয়। বড়ো জোর, আমি বলতে পারি যে এতোগুলো দৃষ্টান্তের বেলায় যখন ঘটনাকে এইভাবে ঘটতে দেখা গিয়েছে তখন মনে করা যেতে পারে যে, না-দেখা দৃষ্টান্তগুলোর বেলাতেও ঘটনাটা এইভাবে ঘটা সম্ভবপর। কিন্তু তাই বলে, ঘটনাটা যে বরাবরই এইভাবে ঘটতে বাধ্য তা আমি বলবো কী করে ? কিসের জোরে ?

তাহলে, নিরীক্ষা আর পরীক্ষা করে আমি যতো দৃষ্টান্তই দেখি না কেন, শুধু তার উপর নির্ভর করে আমি বড়ো জোর এইটুকুই বলতে পারি যে অনেক দৃষ্টান্তর বেলায় এই রকম হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সব দৃষ্টান্তর বেলাতেই যে এই রকম হতে বাধ্য সে-কথা বলবার মতো এখনো কোনো জোর পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ বিজ্ঞান জানতে চাইছে ঠিক সেই রকমের কথাই—অর্থাৎ কিনা, এমন কোনো কথা যা সব দৃষ্টান্তর বেলাতেই সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য।

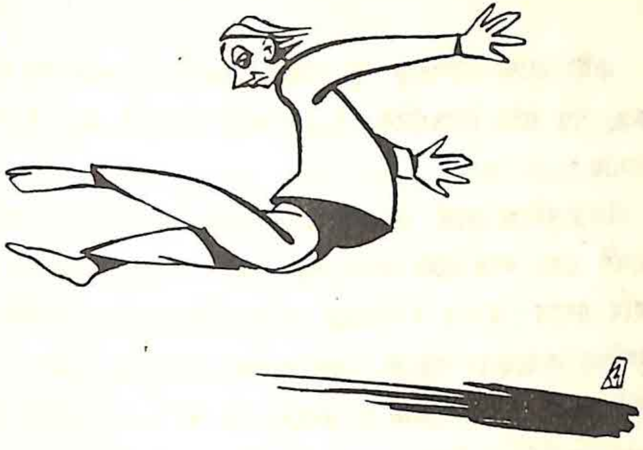
জানা থেকে অজানায় ঝাঁপ

তাহলে এইবার বৈজ্ঞানিক হবার সমস্যাটাকে সংক্ষেপে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

বৈজ্ঞানিক হতে হলে দেখতে হবে : পরীক্ষা আর নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হবে। তা না হলে শুরুই করা যাবে না। অনেক নিরীক্ষা আর অনেক পরীক্ষা করতে হবে—নিষ্ঠা নিয়ে করতে হবে।

কিন্তু হাজার নিরীক্ষা আর পরীক্ষা করেও মোটের ওপর 'কিছু' দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। 'সব' দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়।

অথচ, বৈজ্ঞানিককে শেষ পর্যন্ত এমন কোনো কথা বলতে হবে যা শুধুমাত্র 'কিছু' দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেই সত্যি নয় ; 'সব' দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেই সত্যি—এমন কি সত্যি হতে বাধ্য। তারই নাম প্রকৃতির নিয়ম। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হলো প্রকৃতির নিয়মকে জানা—আবিষ্কার করা।



তাহলে, বৈজ্ঞানিক হতে হলে একটা যেন ঝাঁপ মারবার দরকার পড়ে। কী রকম ঝাঁপ? জানা থেকে অজানার মধ্যে ঝাঁফ।

নিরীক্ষা আর পরীক্ষা করে আমি একজাতীয় 'কিছু' দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান পেলাম। সেখান থেকে আমায় ঝাঁপ মারতে হবে ওই জাতীয় 'সব' দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানের মধ্যে। এখন, এই যে 'কিছু' সম্বন্ধে কথা, এটা হলো আমার কাছে জানা কথা। কেননা, ওই কিছুকে স্বচক্ষে দেখেছি—নিরীক্ষা করেছি, পরীক্ষা করেছি। কিন্তু 'সব' কিছু সম্বন্ধে যা বলতে চলেছি সেটা তো আমার কাছে অজানা কথা। কেননা, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সব কিছু তো আর আমি পরীক্ষা আর নিরীক্ষা করে জানতে পারি না।

তাহলে, বৈজ্ঞানিককে ওই রকম একটা ঝাঁপ মারতে হচ্ছে—জানা থেকে অজানার মধ্যে ঝাঁপ, 'কিছু' দৃষ্টান্ত সংক্রান্ত দেখে-জানা একটা কথা থেকে 'সব' দৃষ্টান্ত সংক্রান্ত একটা নিয়মের দিকে।

এই ভাবে ঝাঁপাতে না পারলে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, বৈজ্ঞানিক যে এই ভাবে ঝাঁপাবে তা কিসের ভরসায় ?

কিছু দৃষ্টান্ত দেখে সব দৃষ্টান্ত সংক্রান্ত একটা কথা বলে দিলেই তো আর হলো না। ধরো, আমি প্রথমবার কলিকাতা শহরে এলাম ; হাওড়া ইস্টিসানে নেমে দেখি, পল্টনে ইস্টিসান গিসগিস করছে। হয়তো, একশোজন লোককে দেখলাম—একশোজনই হলো পল্টন। তখনো তো আমি কলকাতার সব লোক দেখিনি ; কিছু লোক দেখেছি। এই 'কিছু' লোক দেখবার ওপরে নির্ভর করে আমি যদি বলে বসি, 'কলকাতার সব লোকই হলো পল্টন', তাহলে আমি জানা থেকে অজানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো বই কি। কিন্তু কাজটা কি বৈজ্ঞানিকের মতো হবে ?

না। তা হবে না।

কেন নয় ? বৈজ্ঞানিকেরাও তো জানা থেকে অজানায় ঝাঁপ মারেন। একজন বৈজ্ঞানিক যখন বললেন, অমুক বীজাণুর আক্রমণে তমুক রোগ হয়—তখন কি আর তিনি সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখে তারপর বললেন ? নিশ্চয়ই নয়। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত দৃষ্টান্ত কারুর পক্ষেই দেখা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকও মাত্র 'কিছু' দৃষ্টান্ত দেখেছেন—তা সে একশোই হোক আর এক লক্ষই হোক। কিন্তু তিনি যে-কথাটা বলেছেন তা তো আর শুধুমাত্র কিছু দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেই সত্যি নয়। সব দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেই সত্যি—দেখা দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধে সত্যি তো বটেই, এমন কি, না-দেখা দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধেও সত্যি।

তা ঠিক। বৈজ্ঞানিকও দেখা থেকে না-দেখায়, জানা থেকে না-জানায় যাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে এই যাওয়াটা সঠিক। নির্ভরযোগ্য। অথচ আমি কলকাতায় শ'খানেক লোক দেখেই যদি সব লোক সম্বন্ধে কোনো কথা বলে বসি তাহলে তা সঠিক হবার সম্ভাবনা সামান্যই।

কিন্তু এই তফাতটা ঠিক কেন?

কেননা, বৈজ্ঞানিকেরা ওই যে জানা থেকে না-জানায় যাবার আয়োজন করছেন—ওর পিছনে একটা মস্ত বড়ো আবিষ্কার আছে। সেই আবিষ্কারটির উপর নির্ভর করে এগোন বলেই তাঁদের পক্ষে জানা থেকে না-জানায় যাওয়াটা নির্ভরযোগ্য হয়। সঠিক হয়।

কী সেই আশ্চর্য আবিষ্কার? গুরুগম্ভীর ভাষায় তার নাম হলো, কার্য-কারণ সম্বন্ধ। কিন্তু এই গুরুগম্ভীর নামটা দেখে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। ব্যাপারটা আসলে কী তা বুঝতে পারা সত্যিই তেমন কঠিন নয়। ধীরে সুস্থে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

প্রত্যেক ঘটনারই কারণ আছে

বৈজ্ঞানিকেরা বলবেন, দুনিয়ার যেখানে যা-কিছুই ঘটুক না কেন, তার একটা কারণ থাকতে বাধ্য। কোথাও কিছু অকারণে ঘটে না। কোনো কিছুই খামকা ঘটে না; দৈবাত ঘটে না।

পথে যেতে যেতে দেখি, একটা পুঁচকে ছেলে হাউমাউ করে কাঁদছে। শুধোলাম, কাঁদছো কেন খোকা? খোকা বললো,

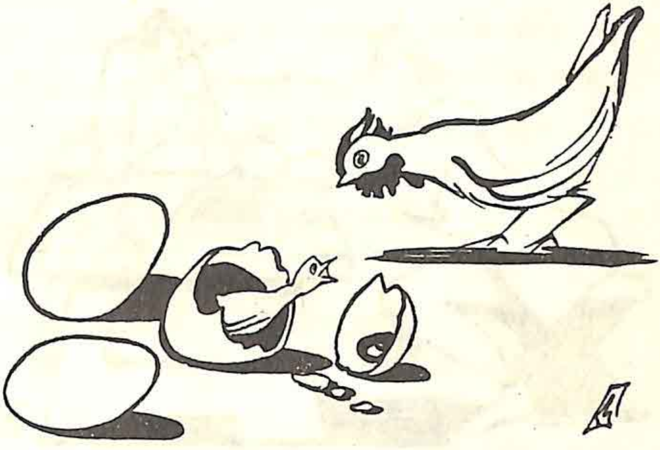
মেজদি আমাকে ইস্টুপিড বলেছে। তার মানে, ছেলেটার কান্নার একটা কারণ আছে। কী কারণ? তার প্রতি তার মেজদির অপমান-জনক ব্যবহার।

শুনলাম, ইস্কুলে তুমি আজ বেশ খানিকক্ষণ বেঞ্চির ওপরে দাঁড়িয়েছিলে! কারণটা কী? পড়া পারো নি, না, ক্লাশে গোলমাল করেছিলে?

রাধানাথদের রোয়াকে বসে একটা লোক হী-হী করে হাসছে। রাধানাথ বললো, লোকটা পাগল—তাই অকারণে ওরকম করে হাসে। আমি বললাম, রাধানাথ তুমি যে এ-রকম ক্যাব্‌লার মতো একটা কথা বললে তার কারণ—তুমি খুব বোকা। রাধানাথ বললো, বোকা বললে বড়ো! প্রমাণ দিতে হবে। আমি বললাম, বোকা নয়তো কি? তুমি বললে, লোকটা অকারণে হাসছে, কেননা লোকটা পাগল। লোকটা যদি সত্যিই পাগল হয় তাহলে তার হাসিটা অকারণ হবে কেন? পাগলামীটাই তো তার ও-রকম হাসির কারণ। রাধানাথ বললো, ঠিক ধরেছো। আমার বোকামীটা তুমি যে ধরে ফেলতে পারলে তার কারণ তুমি খুব চালাক। শুনে আমি খুশী হয়ে গেলাম। খুশী যে হলাম তার কারণ? রাধানাথ আমাকে চালাক বলেছে যে!

পরের পর কয়েকটা নমুনা দেখা গেলো। আর দেখা গেলো, প্রতিটি নমুনার বেলাতেই যে-ঘটনাটা ঘটেছে তার জন্যে একটা করে কারণ থাকছে।

নিউটন দেখলেন, পাকা ফলটা গাছ থেকে মাটির দিকে পড়ছে। কেন পড়ছে? এর কারণ কী? তখন পর্যন্ত কেউই তা জানতো না। নিউটন শুধু জানতেন, কোন ঘটনাই অকারণে



মুরগির বাচ্চার কারণ হলো ডিম। তাই বাচ্চার সঙ্গে ডিমের কার্য-কারণ সম্পর্ক। আবার ডিমের কারণ মুরগি—তাই এ দুয়ের মধ্যেও কার্য-কারণ সম্পর্ক।

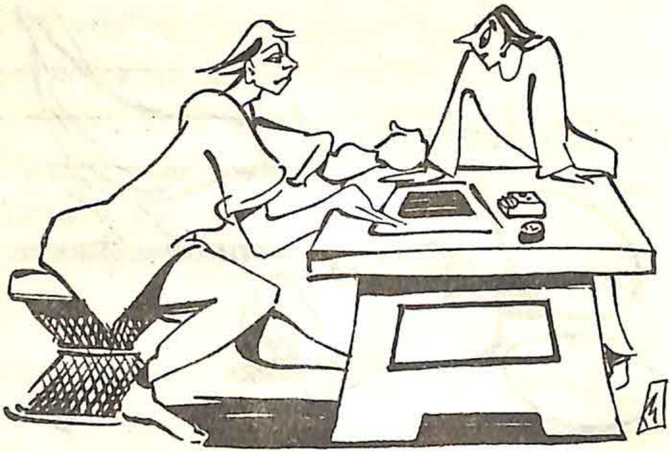
ঘটে না, তাই ফল-পড়া বলে ওই ঘটনাটিরও একটা-না-একটা কারণ থাকতে বাধ্য। তিনি সেই কারণটির অনুসন্ধান শুরু করলেন আর শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। নিউটন যদি ভাবতেন, ঘটনাটা এমনিই ঘটলো, এর কোন কারণ থাকবার কথা নয়,—তাহলে নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের অতো বড়ো আবিষ্কারটা মাঠে মারা যেতো।

এই হলো বিজ্ঞানের মূল কথা। কিছুই অকারণে ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনারই কোন-না-কোন কারণ থাকতে বাধ্য।

যদি তাই হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিকের কাছে দুটো প্রশ্ন ওঠে।

কারণ বলতে ঠিক কী বোঝায়?

একটা ঘটনার কারণকে খুঁজে পাবার কায়দাটা কী?



কারণ মানে কী?

কারণটাকে খুঁজতে হলে জানতে হবে কারণের লক্ষণ ঠিক কী কী। একে একে এই লক্ষণগুলির আলোচনা করা যাক।

অমুক কারণের দরুন তমুক ঘটনা ঘটলো। দুড়ুম করে বন্দুক ছুঁড়লাম, গুলি খেয়ে বাঘটা হালুম করে মরে গেলো। বন্দুক ছোঁড়াটা হলো কারণ, বাঘের মরাটা তারই ফল—শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে কিনা কার্য। তাহলে হিসেব করতে বসে দেখি আমার হাতে রয়েছে দুটি ঘটনা। একটির নাম কারণ, আর একটির নাম কার্য।

প্রথম প্রশ্ন হলো, এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনটে আগে ঘটা দরকার? নিশ্চয়ই কারণটা। আগে বন্দুক মারা, তারপর

বাঘের মরা। আগেই বাঘটা রেলো, তারপর আমি বন্দুক মারলুম—এ-ও কি কখনো হ নাকি? কখনো নয়। কার্য কখনো কারণের আগে আসতেই পারে না। যদি তা পারতো তাহলে পৃথিবীটা কী রকম ওলট-পালট হয়ে যেতো দেখো :

আগে মরা, পরে গলায় দড়ি দেওয়া

আগে চোখের জল, পরে ফেল হবার খবর

আগে চুরি, পরে সিঁধকাঠি

আগে রোগ সারা, পরে চিকিৎসা হওয়া।

কিন্তু এ তো আর সত্যিই হয় না। তার মানে, কারণের আগে কার্য ঘটতেই পারে না।

অতএব আমরা কারণকে সনাক্ত করবার জন্মে একটা লক্ষণের কথা জানতে পেরে গেলাম। লক্ষণটা হলো, কারণটা আগে ঘটতে বাধ্য; অর্থাৎ কার্য ও কারণ নামের দুটি ঘটনার মধ্যে কারণটি পূর্ববর্তী ঘটনা হতে বাধ্য।

ধরা যাক, 'ক' বলে একটা ঘটনার কারণ আমি অনুসন্ধান করছি। 'ক' ঘটবার আগে নানান ঘটনা ঘটেছে, 'ক' ঘটবার পরেও নানান ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে কোনটা 'ক'-র কারণ-? নিশ্চয়ই 'ক' ঘটবার আগে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তারই মধ্যে আমি 'ক'-র কারণটা খুঁজে পাবো। কেননা, ওটা যেহেতু 'ক'-র কারণ সেইহেতু 'ক'-র পরে তা আসতে পারে না; 'ক'-র আগে তা ঘটতে বাধ্য।

তাহলে, 'ক'-র আগে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তারই মধ্যে 'ক'-র কারণটা খুঁজে পাওয়া যাবে। এইটুকু জেনে বেশ আনন্দ লাগলো,. ভাবলাম এবার কারণটাকে খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার

হবে। কিন্তু খোঁজ করতে এগিয়ে দেখি, হা কপাল! এ-যেন একেবারে অথৈ জলে পড়বার যোগাড়।

অথৈ জল কেন? কেননা, 'ক' বলে ঘটনাটি ঘটবার আগে তো আর শুধুমাত্র একটি ঘটনাই ঘটে নি। অজস্র ঘটনা ঘটেছে। একেবারে রাশি রাশি ঘটনা। এই একরাশ ঘটনার মধ্যে ঠিক কোনটি যে 'ক'-এর কারণ তা আমি ঠাহর করবো কেমন করে?

'ক', 'খ' না বলে একটা সত্যিকারের ঘটনার কথাই ধরা যাক। রাধেশ্যামের প্রাণ-বিয়োগ হয়েছে। লোকটা মারা গেলো কেন? তার মৃত্যুর কারণ ঠিক কী? আমরা এখন পর্যন্ত এইটুকুই ঠাহর করেছি, কারণটা হবে পূর্ববর্তী ঘঠনা— অর্থাৎ, যার কারণ খোঁজ করছি তার আগে যা-যা ঘটনা ঘটেছে সেই সব ঘটনার মধ্যেই ওই কারণটাকে পেয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু শুধু এইটুকু সূত্রের উপর নির্ভর করে রাধেশ্যামের মৃত্যুর কারণটা খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কেননা, রাধেশ্যাম মারা যাবার আগে মাত্র একটি ঘটনা ঘটে নি; ঘটেছে অজস্র আর রকমারি ঘটনা: বিলেতে মহারাণীর অভিষেক হয়েছে, বাংলাদেশে পাটের দর পড়েছে, বাজারে ইলিশ মাছ উঠেছে, রাধেশ্যামের কঠিন ব্যায়রাম হয়েছে, রাধেশ্যামের বৌ-এর গলার হার চুরি গিয়েছে—এই রকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঘটনা। তার মধ্যে ঠিক কোন ঘটনাটি রাধেশ্যামের মৃত্যুর কারণ তা ঠিক করবো কেমন করে?

তাহলে, 'কারণটা আগে ঘটতে বাধ্য'—শুধুমাত্র এইটুকু জানলেই তাকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। কারণের আরো কতক গুলো লক্ষণ জানতে পারা দরকার।

ধরা যাক, বিলেতে মহারাণীর অভিষেকের কথাটা। সেটাই কি মৃত্যুর কারণ হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। কেন নয়? কেননা, পৃথিবীতে প্রত্যহই তো মানুষ মরছে, কিন্তু প্রত্যহই তো আর বিলেতে রাণীর অভিষেক হয় না। অথচ, ফল যেহেতু অকারণে ফলে না,—কারণ ছাড়া যেহেতু কার্য ঘটতে পারে না,—সেই হেতু রাণীর অভিষেকটাই যদি মৃত্যুর কারণ হতো তাহলে রাণীর অভিষেক ছাড়া মৃত্যু সম্ভবপর হয় কী করে? কারণ ছাড়া কার্য হয় না; তার থেকেই বোঝা যায় কারণটা শুধুই যে আগে ঘটতে বাধ্য তাই নয়, কারণটা বরাবরই—সমস্ত দৃষ্টান্তের বেলাতেই, প্রতিটি ক্ষেত্রেই—কার্যের আগে ঘটতে বাধ্য। এর কোন ব্যতিক্রম থাকবে না।

আমাদের দৃষ্টান্তটির বেলায় কার্য কী? মৃত্যু। বাংলাদেশে পাটের দর পড়াকে কি তার কারণ বলা যায়? তা যায় না। কেন নয়? কেননা, রাধেশ্যামের দৃষ্টান্ত ছাড়াও আমরা মৃত্যুর আরো অনেক দৃষ্টান্ত জানি; পাটের দর পড়াটাই যদি মৃত্যুর কারণ হতো তাহলে আমাদের জানা সমস্ত দৃষ্টান্তর বেলাতেই মানুষের মৃত্যু হবার আগে পাটের দর পড়তো। কিন্তু তা তো আর সত্যি নয়। রাম মরেছে, শ্যাম মরেছে, সক্রেটিস মরেছে, প্লেটো মরেছে,—পৃথিবীতে কতো কোটি কোটি মানুষই না মরেছে। কিন্তু তাদের মরবার আগে বরাবরই কি বাংলাদেশে পাটের দর পড়েছে? নিশ্চয়ই নয়। তাই ওই দর-পড়াকে মৃত্যুর কারণ বললে ভুল করা হবে।

তাহলে শুধুমাত্র আগে ঘটা-ঘটনাই কারণ হবে না। কারণ হতে গেলে প্রতিটি দৃষ্টান্তর বেলাতেই আগে-ঘটা-ঘটনা হতে

হবে। যদি দেখি 'ক' ছাড়া 'খ' ঘটে না তাহলেই বোঝা যাবে 'ক' হ.া 'খ'-এর কারণ।

তাহলে, কারণের দুটো লক্ষণ পাওয়া গেলো :

এক : কারণটা আগে ঘটা দরকার।

দুই বরাবরই (সব দৃষ্টান্তর বেলাতেই) কারণটা আগে ঘটা দরকার।

আরো কথা আছে। গাছে একটা পাখি বসেছিলো। আমি ধড়াস করে বন্দুক চালিয়ে দিলাম। কিন্তু এমনই আমার হাতের তাক যে পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো। উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে এ-গাছ থেকে ও-গাছ, এ-দেশ থেকে ও-দেশ, পার হয়ে যেতে যেতে পাখিটা শেষ পর্যন্ত একদিন মরে গেলো। তখন কি আমি বলবো যে পাখিটার মৃত্যুর কারণ হলো আমার বন্দুক ছোঁড়া? নিশ্চয়ই নয়। কেননা, তার দরুনই যদি পাখিটা মরতো তাহলে তো সঙ্গেসঙ্গে মরতো। তাই দুটো ঘটনার মধ্যে যদি সময়ের ফাঁক অনেকখানি হয় তাহলে একটা ঘটনাকে আর একটা ঘটনার কারণ বলা যাবে না। কিন্তু তার মানে কি এই যে কোনো একটা ঘটনার খুব সুদূর কারণ বলে কিছু হয় না? হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সেখানে একের প. এক কারণের একটা মালার মতো থাকে : 'ক'-র দরুন 'খ', 'খ'-র দরুন 'গ', 'গ'-র দরুন 'ঘ', 'ঘ'-র দরুন 'ঙ'—এক্ষেত্রে 'ঙ'-র খুব সুদূর কারণ হিসেবে 'ক'-র কথা উল্লেখ করা যায় বই কি। কিন্তু ওইভাবে সুদূর কারণটাকেই আসল কারণ না বলে বরং বলা উচিত 'ঙ'-র কারণ হলো 'ঘ', 'ঘ'-এর কারণ হলো 'গ', 'গ'-এর কারণ হলো 'খ', 'খ'-এর কারণ 'ক'। এবং এই

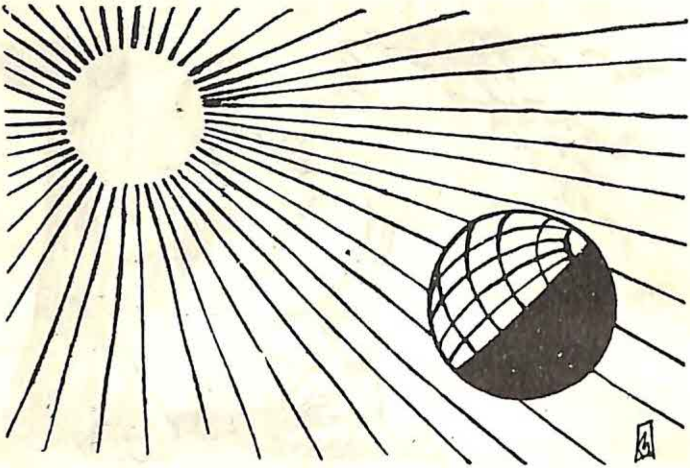


'ক' আর 'খ' কিংবা 'ঘ' আর 'ঙ'-র মধ্যে সময়ের ফাঁক নেই।

তাহলে কারণের তৃতীয় লক্ষণটাকেও বের করা গেলো : কারণ-কে কার্যের ঠিক আগে ঘটতে হবে। কারণ আর কার্যের মধ্যে বড়ো রকমের সময়ের ফাঁক থাকা চলবে না।

কিন্তু এতোক্ষণ কারণ-এর যে-তিনটে লক্ষণের কথা বলা হলো তাই কি যথেষ্ট? ধরা যাক, দিন আর রাত্রির কথা। দিনের আগে রাত। প্রতি ক্ষেত্রেই তাই : এমন দৃষ্টান্ত ভাবা যায় না যেখানে আগে রাত ছাড়াই দিন হচ্ছে। রাতের পরেই দিন—অর্থাৎ, রাত আর দিনের মাঝখানে সময়ের ফাঁকও নেই। তার মানে, কারণের ওই তিনটে লক্ষণই রাত-এর বেলায় খেটে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে কি রাত-কেই দিনের কারণ বলা চলবে?

আবার, একই হিসেবে দিনকেও রাতের কারণ বলবার কথা উঠতে পারে : রাতের আগে দিন, প্রতিটি দৃষ্টান্তেই তাই, দিন আর রাতের মাঝখানে সময়ের ফাঁক নেই!



কিন্তু, আসল কথা হলো, রাতকেও দিনের কারণ বলতে পারি না ; দিনকেও রাতের কারণ বলতে পারি না। রাত আর দিন—দুয়েরই কারণ হলো সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর চর্কিপাক। এই ব্যাপারটির উপরেই রাতও নির্ভর করছে, দিনও নির্ভর করছে।

তাহলে, কারণ হওয়ার তিনটে লক্ষণ মানা সত্ত্বেও দিনের পক্ষে রাতের, বা রাতের পক্ষে দিনের, কারণ হওয়া হলো না। কেন হলো না? কেননা, উভয়ের ওপরেই অন্য একটা ব্যাপারের প্রভাব এসে পড়ছে—ব্যাপারটা হলো সূর্য আর পৃথিবীর সম্পর্ক। আর এর থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে কারণ-এর একটা চতুর্থ লক্ষণ থাকা চাই। কী লক্ষণ? অন্য ব্যাপারের প্রভাব থেকে মুক্তি।

কারণ মানে কী?— তাহলে এতোক্ষণে এই প্রশ্নের একটা মোটামুটি জবাব পাওয়া সম্ভব হবে। কারণ হলো :

এমনতরো ঘটনা যা কার্যর আগে ঘটে
প্রত্যেক দৃষ্টান্তের বেলাতেই কার্যর আগে উপস্থিত থাকে
কার্যর ঠিক অব্যবহিত আগে ঘটে এবং
যার উপর অন্য কোনো ব্যাপারের প্রভাব নেই।

কারণ-আবিষ্কারের কায়দা

কারণের এই মানেটা ভালো করে মনে রাখলে বৈজ্ঞানিকেরা কারণ আবিষ্কারের যে কায়দাগুলো অনুসরণ করেন তা বুঝতে অসুবিধে হবে না।

কায়দাগুলোর নমুনা দেখা যাক।

একটা কায়দা : রাম আম খেয়েছে, তেতো শসা খেয়েছে—রামের পেট কামড়াচ্ছে। রঘু ভাত খেয়েছে, ডাল খেয়েছে, তেতো শসা খেয়েছে—রঘুর পেট কামড়াচ্ছে। ভুতো ঝোল খেয়েছে, ভাত খেয়েছে, তেতো শসা খেয়েছে—ভুতোর পেট কামড়াচ্ছে।

এই রকম অনেক অজস্র দৃষ্টান্ত দেখালাম। প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তর বেলাতেই পেট কামড়ানোর আগে শসা-খাওয়ার ব্যাপার আছে। তাছাড়াও অবশ্য আরো নানান ব্যাপার রয়েছে—কিন্তু সেই অন্যান্য ব্যাপারগুলো সব দৃষ্টান্তর বেলায় বর্তমান নেই : পেট কামড়ানোর আগে কেউবা ঝোল খেয়েছে, কেউবা আম খেয়েছে, কেউবা ডাল খেয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে সব-দৃষ্টান্তর মধ্যে মিল আছে। যে-কজনকে তেতো শসা খেতে দেখলাম সেই ক'জনেরই পেট কামড়াতে লাগলো। তাহলে সন্দেহ করতে হবে, তেতো শসা খাওয়াটাই হলো পেট-কামড়ানোর কারণ।



স্নুনীল যেদিনই খেলেছে সেদিনই জিত ; যেদিন খেলে নি সেদিনই হার……

আর একটা কায়দার নমুনা : আমাদের ফুটবল টিম এ-বছর অনেকগুলো ম্যাচ্ খেলেছে। কতকগুলোয় জিতেছে, কতকগুলোয় হেরেছে : কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করার আছে! স্নুনীল যেদিনই আমাদের টিমে খেলেছে সেদিনই জিত হয়েছে, যেদিন স্নুনীল খেলে নি সেদিনই আমাদের হার হয়েছে। তাহলে জিত হবার কারণ কী ? স্নুনীলের খেলা।

আর একটা কায়দার নমুনা : একটা জিনিসকে যতো বেশি গরম করছি ততোই তার আয়তন বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে, আয়তন বাড়বার কারণ কি ? উত্তাপ বাড়ানো।

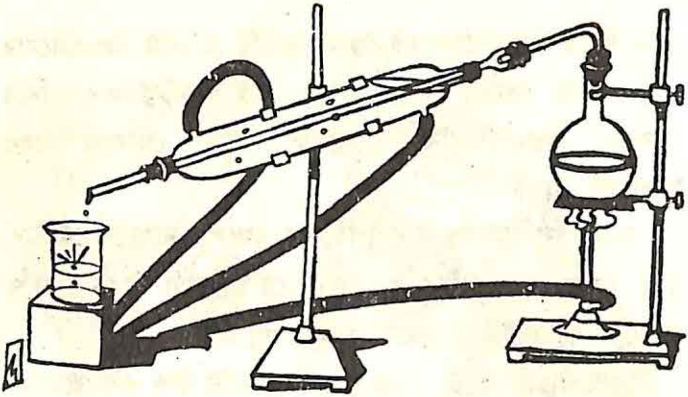
আর একটা কায়দার নমুনা : জর্দা খেলুম আর তেতো শসা খেলুম। তারপর আমার মাথা ঘুরলো আর পেট কামড়ালো।

এখন আমি আগে থাকতেই জেনে রেখেছি যে পেট কামড়ানোর কারণ হলো তেতো শসা খাওয়া। এই জ্ঞানটুকুকে বাদ দিয়ে দিলাম। তাহলে বাকি রইলো কি? মাথা ঘোরার কারণ হলো জর্দা খাওয়া।

কারণ আবিষ্কারের কায়দা হিসেবে এগুলোর মধ্যে কোনোটার মূল্য বেশি, কোনোটার বা কম। যে-কায়দাটা সব চেয়ে বেশি মূল্যবান এবার সেটার একটা নমুনা দেখা যাক।

দুটো খাঁচায় দুটো ইঁদুর পুরলাম—দুটো ঠিক এক বয়েসের একই রকম ইঁদুর। দুটো খাঁচাই রাখলাম ঠিক একই রকম অবস্থায়। দুটো ইঁদুরকে হুবহু একই খাবার খেতে দিলাম—কেবল একটুখানি তফাত রইলো। তফাতটা এই যে, প্রথম খাঁচার ইঁদুরটার খাবারের সঙ্গে 'ভিটামিন বি' রইলো, দ্বিতীয় খাঁচার ইঁদুরের খাবারের সঙ্গে 'ভিটামিন বি' একটুও রইলো না। তারপর, খাবারের এই তফাতটুকুর দরুন ঠিক কী ফল হয় তাই দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, প্রথম খাঁচার ইঁদুরটা দিব্বি সুস্থ সবল হয়ে রয়েছে আর দ্বিতীয় খাঁচার ইঁদুরটার বেরিবেরি রোগ হয়েছে। এই দেখে আমি কী বুঝতে পারবো? বুঝতে পারবো যে, তাহলে 'ভিটামিন বি'-র অভাবই হলো বেরিবেরি রোগের কারণ।

কারণ-আবিষ্কারের কায়দাগুলির মধ্যে এইটেই সবচেয়ে মূল্যবান কেন? কেননা, ল্যাবরেটারির মধ্যে পরীক্ষা করে তবেই এই কায়দার প্রয়োগ করতে হয়: দুটো দৃষ্টান্তর মধ্যে সব ব্যাপারে মিল থাকবে কেবল একটি ব্যাপার ছাড়া। ল্যাবরেটারির মধ্যে নিজের আয়ত্তাধীন পরিবেশ ছাড়া কী করে



সযত্নে পরীক্ষা করে পাওয়া দৃষ্টান্ত

আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, শুধু একটিমাত্র বিষয়ে দুটি দৃষ্টান্তর মধ্যে তফাত আছে আর বাকি সমস্ত বিষয়ে দুটির মধ্যে মিল আছে? এইভাবে সযত্নে-পরীক্ষা করে-পাওয়া দৃষ্টান্তর উপর নির্ভর করে অগ্রসর হওয়া যায় বলেই এই কায়দাটাই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

বিজ্ঞান মানে কী ?

তাহলে এইবারে আগাগোড়া সবটুকু কথা একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

বিজ্ঞানের একটা বর্ণনা হিসেবে আমরা এই বলে শুরু করেছিলাম যে, বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এমন জ্ঞান চাইছে যা কিনা সবক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হতে বাধ্য। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওই রকমের কথাকেই বলে প্রকৃতির নিয়ম। তাই

আমরা ঘুরিয়ে বলতে পারি যে বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মকে জানতে চাইছে।

একমেটে বর্ণনা হিসেবে এই হলো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এরপর প্রশ্ন ওঠে, উপায়টা নিয়ে। কী করে বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম জানতে পারবে? এর উত্তরে আমরা বললাম, প্রকৃতিকে জানতে হলে শুরু করতে হবে প্রকৃতিকে দেখে। দেখা মানে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা, যার সাধু নাম নিরীক্ষা আর যার ল্যাবরেটারি-সংস্করণকে বলে পরীক্ষা।

কিন্তু নিরীক্ষা আর পরীক্ষার উপর নির্ভর করে,—প্রকৃতির এমন কোনো জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয় যা সবক্ষেত্রে সত্য এবং সত্য হতে বাধ্য। কেননা, আমরা পরীক্ষা আর নিরীক্ষার চেষ্টা যতোই বাড়াই না কেন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব: দেখার উপর নির্ভর করে 'কিছু'-কে জানা যায়—সব কিছুকে জানা যায় না। বৈজ্ঞানিক তাই দেখার উপর নির্ভর করে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত যেন অজানার মধ্যে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু জানা থেকে অজানার মধ্যে যাবার এই চেষ্টাটা তো নির্ভর-যোগ্য হওয়া দরকার। কিসের ভিত্তিতে তা নির্ভরযোগ্য হতে পারে? একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করবার ভিত্তিতে। তাই বৈজ্ঞানিকদের প্রধানতম চেষ্টাই হলো, কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করবার। ঘটনাটা কেন ঘটলো? তার কারণ কী? এ-প্রশ্নের জবাব যতোক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া না যাচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় ক্লান্তি নেই। এই 'কেন'-র

জবাবটা পেয়ে গেলে পর,—কারণকে আবিষ্কার করতে পারবার পর,—বৈজ্ঞানিকেরা সাহস পান এমন কথা বলবার যা সব দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেই খেটে যাবে : শুধুমাত্র যে-কটি দৃষ্টান্ত দেখেছি সে-কটি সম্বন্ধেই নয়।

ম্যালেরিয়া রোগ কেন হয়—এ-প্রশ্নর জবাব পেলে এমন কথা বলতে পারবো যা শুধুমাত্র অতীতের বা বর্তমানের ম্যালেরিয়া রোগীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, ভবিষ্যতের রোগীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

কিন্তু এইখানে আরো একটা কথা আছে। 'কারণ' আবিষ্কার করতে পারবার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেই কথা বলবার সাহস যে পাচ্ছেন তারও একটা কারণ আছে। সে-কারণটা হলো, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রকৃতিটা খামখেয়ালের রাজ্য নয়, নিয়মের রাজ্য। আর তাই আজকের দিনে যে-কারণের দরুন যে-ঘটনা ঘটছে, কালকের দিনেও সেই কারণের দরুন সেই ঘটনাই ঘটবে। এ-বিশ্বাস যে কোথা থেকে পাওয়া গেলো তা নিয়েও অনেক তর্ক আছে। এখন আর আমরা সে-সব তর্ক তুলতে চাই না। সোজা কথা এই যে, ওই বিশ্বাসটি না হলে বিজ্ঞানই সম্ভব হয় না। খুব সহজ ভাবেই কথাটা ভেবে দেখো না! বিজ্ঞান কী জানতে চাইছে? কিসের জ্ঞান পেতে চাইছে? প্রকৃতির নিয়মের। এখন এই প্রকৃতিতে নিয়ম বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে আর কারুর পক্ষে বৈজ্ঞানিক হবার সম্ভাবনাটা থাকবে কী করে?

কথাটা যে সত্যি তা বুঝবো কেমন করে?

এইবার আরো কতকগুলো সমস্যা তুলতে হবে। সেই সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পেলে বিজ্ঞানের ওই একমেটে বর্ণনাটিকে শুধরে আরো ভালো একটা বর্ণনায় পৌঁছবার চেষ্টা করা যাবে।

বিজ্ঞান এমন কথা জানতে চাইছে যা সবক্ষেত্রে সত্য এবং সত্য হতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো একটা কথা সত্যি কিনা তা জানবার উপায়টা কী হবে? কী করে আমরা তা যাচাই করবো?

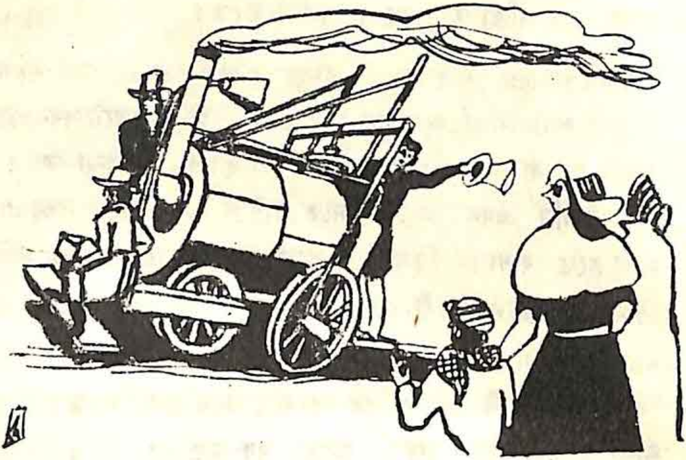
এই প্রশ্ন নিয়েও পণ্ডিত মহলে বেজায় তর্ক-বিতর্ক উঠেছে। নানা মুনির নানা মত। অতো সব মতামত নিয়ে ঢালাও আলোচনা তোলবার মতো সুযোগ-সুবিধে আমাদের হবে না। আমরা এখানে শুধুমাত্র সেই মতটিরই আলোচনা তুলবো যেটা আমাদের কাছে সঠিক ঠেকেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, ম্যারিয়া-বীজাণুর দরুন ম্যালেরিরা রোগ হয়।

সত্যি নাকি? কী করে বুঝবো? একটা ইঁদুরের গায়ে ওই বীজাণু ফুঁড়ে দিয়ে দেখা যাক না। ফুঁড়ে দিলাম। আর দেখলাম, সত্যি তাই। ইঁদুরটার সত্যিই ম্যালেরিয়া হলো। হাতে-নাতে বোঝা গেলো, বৈজ্ঞানিকের কথাটা মনগড়া নয়। সত্যি কথা।

বৈজ্ঞানিক বললেন, পেনিসিলিন দিলে নিউমোনিয়া সেরে যায়।

সত্যি নাকি? কী করে বুঝবো? নিউমোনিয়া রোগীকে



বাষ্পশক্তিতে ট্রেন চালানো যায়। কথাটা সত্যি কিনা তা যাচাই করবার উপায় হলো বাস্তবিকই বাষ্প শক্তিতে ট্রেন চালিয়ে দেখা…

পেনিসিলিন দেবার পর সত্যি তার রোগ সেরে গেলো যে! আর এই থেকেই বুঝতে পারলাম, বৈজ্ঞানিকের ওই কথাটি বানানো কথা নয়—সত্যি কথা।

লেবুটা টক। এ-কথা কি সত্যি, না, মিথ্যে? চেখে দেখলেই বুঝতে পারবে।

আগুনটা ভয়নক গরম। এ-কথা কি সত্যি, না, মিথ্যে? হাত দিয়ে দেখো—মালুম পাবে।

যদি তুমি শুধুই মাথা ঘামাও তাহলে হাজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারবে না, একটা কথা সত্যি না মিথ্যে। তা যাচাই করতে হলে তোমাকে গতর-খাটাতেও হবে—কাজ করে দেখতে

হবে। একমাত্র কাজের মধ্যে দিয়েই যাচাই হবে, কোন কথাটা সত্যি আর কোন কথাটা মিথ্যে।

কাজে খাটানোর সাধু নাম হলো 'প্রয়োগ'। তাহলে, ওই প্রয়োগই হলো সত্য-বিচারের কষ্টি-পাথর। শুধু যদি মাথা খাটাও, তাহলে হাজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারবে না একটা কথা সত্যি না মিথ্যে। অথচ, কথাটাকে কাজে খাটাবার চেষ্টা করো—অনায়াসেই বুঝতে পারবে সেটা সত্যি কি না।

বিজ্ঞান আমাদের যে-জ্ঞান দিয়েছে তা যে কতোখানি সত্যি তার প্রমাণ আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তেই পাওয়া যায়। বিজলি-আলোয় বসে লিখছি, মাথার উপর বিদ্যুতের পাখা ঘুরছে। বাসে চেপে শ্যামবাজার ঘুরে এলাম, শ্যামবাবু ট্রেনে চেপে বোম্বাই গেলেন, সেখান থেকে জাহাজে চড়ে বিলেত যাত্রা করবেন। নটবর নাকি হাওয়াই জাহাজে চেপে হাউইদ্বীপ বেড়াতে গেলো?

প্রতি পদেই দেখছি, আমাদের কাজের জীবনটা কী ভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে রয়েছে। আর আমাদের এই কাজের জীবনে অমন ভাবে খেটে যাচ্ছে বলেই প্রতি পদে আমরা বুঝেছি যে বিজ্ঞান কতো অভ্রান্ত, কতো সত্যি।

জ্ঞান বড়ো না কর্ম বড়ো?

তাহলে বিজ্ঞানের সঙ্গে কাজের জীবনের সম্পর্কটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা চলে না। অথচ, এককালে সেই চেষ্টাই চলেছিলো। পণ্ডিতেরা প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, বিজ্ঞানের

জ্ঞান হলো বিশুদ্ধ জ্ঞান, তার সঙ্গে প্রয়োগের—ব্যবহারে লাগা-না-লাগার—একেবারে কোনোই সম্পর্ক নেই।

কথাটা ভুল।

কথাটা যে ভুল তার আর একটা প্রমাণ হলো ইতিহাস। কেননা, ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বাস্তব জীবনের কাজের তাগিদেই। আর, বাস্তব জীবনের কাজের তাগিদই বিজ্ঞানকে বার বার নতুন উদ্দীপনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানকে আমরা ঠিকমতো বুঝতেই পারবো না, যদি না জানার সঙ্গে কাজের—জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োগের—সম্পর্কটা বেশ ভালো করে খতিয়ে দেখে নি। খতিয়ে দেখবার দরকার এত বেশি, তার কারণ এই ব্যাপারটি নিয়েই অনেকের মনে অনেক রকম ভুল ধারণা আছে।

আমাদের দেশে খুব পুরোনো কাল থেকে একটা তর্ক চলে এসেছে: জ্ঞান বড়ো, না, কর্ম বড়ো? একদল বলেছেন, জ্ঞান বড়ো—তার তুলনায় কর্মটা খারাপ, কর্মটা ছোটো। আর এক-দল বলেছেন, কর্ম বড়ো—তার তুলনায় জ্ঞান মোটেই উঁচু ধরনের কিছু নয়। অবশ্য, আমাদের দেশের সেকালের পণ্ডিতদের মধ্যে ঠিক বিজ্ঞানকে বোঝবার তাগিদে এ-তর্ক ওঠেনি। তর্কটা উঠে-ছিলো অন্য ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু তাহলেও জ্ঞান-বনাম-কর্ম নিয়ে তর্ক একটা উঠেছিলো আর সে-তর্ক হয়েছিলো রীতিমতো তুমুল।

আমরা বলতে চাইছি, বিজ্ঞানের দিক থেকে এ-তর্কর সত্যিই মানে হয় না। কেননা, বিজ্ঞান অনুসারে জ্ঞান ছাড়া কর্ম হয়

না আর কর্ম ছাড়া জ্ঞান হয় না। ়াই জ্ঞান বড়ো না কর্ম বড়ো তাই নিয়ে তর্ক জোড়বারও মানে য় না।

প্রমান ?

তাহলে শোনো, একেবারে শুরুর কথা থেকেই শুরু করি।

হাত আর মগজ

এ-কথা আজ আর কে না জানে যে আদ্যিকালের একদল বনমানুষই বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে গিয়েছিলো। ঠিক কী করে বদলালো, কবে বদলালো, কেন বদলালো,—এ-সব প্রশ্নের একেবারে নিখুঁত জবাব অবশ্য আজো কেউই দিতে পারেন নি। তবুও এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম নির্ভরযোগ্য কথা আন্দাজ করতে পেরেছেন বই কি।

সেই আদ্যিকালে পৃথিবীর বুকের ওপর থেকে কোনো এক জায়গার খানিকটা বনজঙ্গল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো—হয়তো আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিলো, হয়তো ধ্বসে গিয়েছিলো মাটির তলায়, কে জানে! আর তার ফলে হলো কি, সে-এলাকার বনমানুষেরা গাছের বাসা ছেড়ে মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হলো। গাছে থাকতে গেলে চারটে পায়ের দরকার পড়ে, কিন্তু সমতল জমির ওপরে বাঁচবার সময় একজোড়া পাই যথেষ্ট। অনেক হাজার বছরের চেষ্টায় সেই বনমানুষের বংশধররাও সমতল জমিতে চার পা ছেড়ে দু পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো।

কিন্তু তখন তাদের সামনের পা-জোড়াটার কী হলো ? সেই পা-জোড়া যেন মুক্তি পেলো, আর মুক্তি পেলো বলেই বনমানুষদের

বংশধরেরা তাই দিয়ে দশ রকমের জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতে, নাড়াচাড়া করতে করতে, শেষ পর্যন্ত বানাতে শিখলো হাতিয়ার। হাত দিয়ে ধরা হয়, তাই নাম হাতিয়ার। অর্থাৎ কিনা, এখন থেকে বনমানুষের সেই বংশধরদের সামনের পা-জোড়াকে আর পা বলা চলে না—সে-দুটো বদলে মানুষের হাত হয়ে গেলো।

যাদুঘরে গেলে দেখতে পাবে কাঁচের আলমারির মধ্যে সাজানো রয়েছে খুব প্রাচীন কালের কিছু কিছু হাতিয়ার। আজকের দিনে সেগুলোর দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে তোমার-আমার হয়তো হাসিই পাবে—এতো স্থূল, এতো বাজে রকমের সে-সব হাতিয়ার। আসলে কিন্তু ভারি আশ্চর্য আর অপরূপ ওই জিনিসগুলি। মানুষ যে ঠিক কোথায় পশুর রাজ্য ছেড়ে এসেছে তার সীমানা নির্দেশ করছে ওই হাতিয়ারগুলিই। কেননা, জানোয়ারদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ ঠিক এইখানটিতেই : জানোয়ারদের হাত নেই, জানোয়াররা হাতিয়ার বানাতে পারে না, আর তাই জানোয়ারেরা প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করে, প্রকৃতির মুখ চেয়ে বাঁচে। মানুষের হাত আছে, মানুষের হাতে হাতিয়ার আছে,—মানুষ তাই পারে প্রকৃতিকে বদল করতে, নিজের চাহিদামতো জিনিস আদায় করে নিতে প্রকৃতির কাছ থেকে।

কিন্তু এইখানে একটা দারুণ মজার কথা আছে। বনমানুষের সেই বংশধরদের সামনের পা-জোড়া বদলে হাত হওয়ার সঙ্গে তাল রেখেই বদল হয়েছে মানুষের খুলির মধ্যেকার সেই জিনিসটি, যার নাম দেওয়া হয় মগজ।

হাতের দরুন কাজ। মগজের দরুন জ্ঞান। হাতের সঙ্গে

মগজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক একেবারে শুরুর যুগ থেকেই। তাই শুরুর যুগ থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কর্মর সঙ্গে জ্ঞানের।

প্রকৃতিকে জয় করা আর প্রকৃতিকে জানা

দিনের পর দিন মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করার মানেটা ঠিক কী? মানুষ কি প্রকৃতির নিয়মকানুনকে উড়িয়ে দিতে পারে বলে, বা, নিজের মর্জি-মাফিক প্রকৃতির ঘাড়ে কতকগুলো নিয়মকানুন চাপিয়ে নিতে পারে বলেই, প্রকৃতিকে জয় করতে পারছে? মোটেই নয়। তার বদলে মানুষ যতো ভালো করে প্রকৃতির নিয়মকানুনকে চিনতে পারছে আর জানতে পারছে ততোই ভালো করে পারছে এগুলিকে মানতে। আর মানতে পারছে বলেই এগুলিকে কাজেও লাগাতে পারছে,—নিজের দরকার মতো, নিজের উদ্দেশ্য মতো কাজে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, আকাশ-বাতাসের নিয়ম, আর এই রকমেরই আরো অনেক নিয়ম জানতে পেরেছে আর মানতে পেরেছে বলেই মানুষ আজ উড়োজাহাজ বানিয়ে জয় করেছে আকাশকে। রোগ ভোগ কেন হয়, এই নিয়মটি জানতে পেরেছে বলেই মানুষ আজ জয় করতে পেরেছে রোগ ভোগকে।

প্রকৃতিকে জয় করা। তার মানে কাজ।

প্রকৃতির নিয়মকে জানা। তার মানে জ্ঞান।

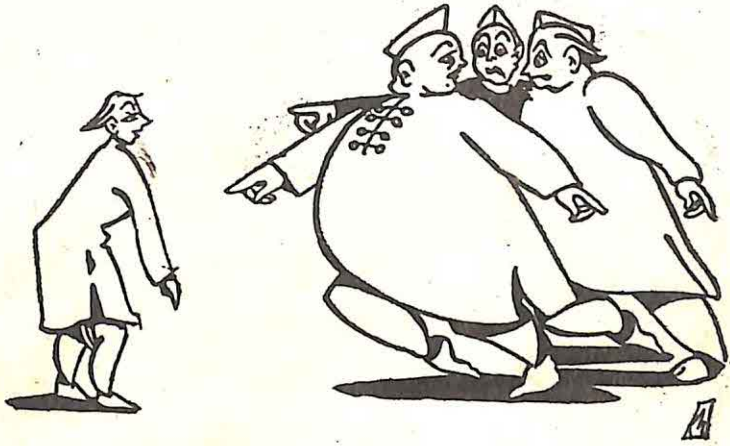
প্রকৃতিকে জানার উলটো পিঠেই প্রকৃতিকে জয় করবার কথা। প্রকৃতিকে জয় করবার উলটো পিঠেই প্রকৃতিকে জানবার কথা। তার মানে? মানে, জ্ঞানের উলটো পিঠেই কাজ, কাজের উলটো পিঠেই জ্ঞান। জ্ঞান বাদ দিয়ে কাজের অবস্থাটা

অন্ধর মতো ; কাজ বাদ দিয়ে জ্ঞানের অবস্থাটা পঙ্গুর মতো। আর যদি তাই হয় তাহলে দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ককে না-মানলে কী করে চলবে ?

কর্মর সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক শুধুই যে শুরুর যুগটুকুতে, তাই নয়। মানুষ যদি চুপচাপ হাতপা গুটিয়ে বসে থাকতো, যদি যুগের পর যুগ ধরে প্রকৃতিকে জয় করবার পণ নিয়ে এগুতে না পারতো,—তাহলে প্রকৃতির রহস্য তার কাছে ধরাই পড়তো না। আবার প্রকৃতির রহস্য যদি তার কাছে ধরা না পড়তো তাহলে তার পক্ষে সম্ভবই হতো না প্রকৃতিকে জয় করা।

কর্ম আর জ্ঞান। জ্ঞান আর কর্ম। যেন একই চেষ্টার এ-পিঠ ও-পিঠ।

তবু একদল পণ্ডিত কর্মকে খাটো করতে, ছোটো বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন কেন? কেন তাঁরা চেয়েছিলেন জ্ঞানের গরীমাকেই অনেক বড়ো করে দেখাতে, প্রমাণ করতে যে বিজ্ঞান মানে শুধু জ্ঞান—নির্মল, বিশুদ্ধ জ্ঞান? তার কারণ, মানুষের সমাজটারই এমন দশা হয়েছিলো যে হাতের কাজের ভারটা যাদের ওপর তাদের নীচু শ্রেণীর মানুষ বলে ক্রীতদাস, চাষাভূষো, কুলিমজুর বলে—ধরে নেওয়া হতো। যারা গতর খাটায় আর যারা মাথা খাটায় তারা এক মানুষ নয় ; যারা গতর খাটায় তারা নীচু আর যারা মাথা খাটায় তারা উঁচু ধরনের লোক। গত হাজার কয়েক বছর ধরে মানুষের সমাজের দশাটা মোটের ওপর এই রকমেরই। আর তাই জ্ঞান নিয়ে বড়ো বেশি গর্ব, কর্মকে খাটো করবার মোহ, আর কর্মর সঙ্গে জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা যেন দেখেও না দেখা।



গত কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ গতর-খাটানোকে ছোটো-লোকের লক্ষণ বলে মনে করেছে আর পণ্ডিতেরা তাই ভেবে-ছেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নেই…

কিন্তু সেটা ভুল।

কর্মের কষ্টিপাথরে যে-জ্ঞানকে যাচাই করা যায় নি সে-জ্ঞান জ্ঞান নয়, তার কোন মূল্য নেই।